আট আনা সংস্করণ

[নবম গ্রন্থ]

শুকতারা।

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,

প্রণীত

৭৮।২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মাঘ, ১৩২৫

উৎসর্গ

মাতৃ-চরণে

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীনারায়ণের কৃপায় আমাদের আট আনা সংস্করণের নবম গ্রন্থ "শুকতারা" প্রকাশিত হইল, সুলভে সৎ-সাহিত্যের প্রচারোদ্দেশে—এই কাগজের মহার্ঘতার দিনে—ক্ষুদ্র শক্তি আমরা এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম, তখন বুঝিতে পারি নাই আমরা ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব কি না,—এখন সাহিত্য-সুহৃদের স্নেহদৃষ্টি ও শ্রীশ্রীনারায়ণের কৃপা এতদুভয়ই আমাদের এই 'সিরিজের' অক্ষয় কবচ স্বরূপ হইয়াছে।

পরিশেষে সাহিত্যানুরাগি-মহোদয়গণের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া আমাদের এই 'সিরিজে'র তথা বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। **কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না, মাত্র পত্র লিখিয়া গ্রাহক হইলে,** যে কয়খানি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভি, পি, ডাকে পাঠাইব এবং যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে, তখন সেইখানি ভি, পি, ডাকে পাঠাইব। এই 'সিরিজে'র দশম গ্রন্থ যন্ত্রস্থ। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত "অপবাদ" নামক একখানি সুন্দর উপন্যাসও যন্ত্রস্থ। ইতি—

মাঘ,
১৩২৪ সাল।

শুকতারা

রূপের নেশা

(১)

বাল্যকাল হইতেই পাগল পাগলিনীর প্রতি আমি বিশেষভাবে আকৃষ্ট। উহারা সর্ব্বদাই কোন্ এক রহস্যময় অদ্ভুত স্বপ্নরাজ্যে, বাতুলতার দুর্ভেদ্য মেঘলোকে বাস করে। পৃথিবীতে তাহারা যাহা-কিছু দেখিয়াছে, যাহা-কিছু ভোগ করিয়াছে, সেখানে সবই তাহাদের জন্য পুনর্ব্বার নূতন হইয়া বাস্তব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক কল্পনাময় অস্তিত্ব ধারণ করে।

তাহাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া কোনও জিনিষ পৃথিবীতে নাই। তাহারা কল্পনাকে বাস্তবে, অস্বাভাবিককে স্বাভাবিকে পরিণত করে। ন্যায়, বিবেক, জ্ঞান, বুদ্ধি, সবই সেই উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার প্রবল আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হয়। কোন বাধা-বিঘ্নই, তাহাদের কল্পনার গতিরোধ করিতে পারে না।

অতি দুরূহ কার্য্যেও সফলকাম হইতে তাহাদের কোন প্রয়াস পাইতে হয় না। বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়ালের বশেই তাহারা নিজেদের রাজা উজির বা দেব দেবী জ্ঞান করে, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর সাজে, জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ একমুহূর্ত্তে ভোগ করে। শোকতাপপূর্ণ সংসারে কেবল তাহারাই যথার্থ সুখী, কারণ তাহাদের সহিত বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নাই।

ইহাদের কার্য্যকলাপ ও মানসিক গতিবিধি লক্ষ্য করিতে আমি চিরদিনই ভালবাসি। সৌভাগ্যবশতঃ আমার এক বিশেষ সুবিধাও জুটিয়াছিল। আমার এক বন্ধু সরকারী পাগলাগারদের ডাক্তার নিযুক্ত ছিল। তাহার সহিত মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আমি গারদ পরিদর্শন করিতে যাইতাম। একদিন গারদে ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিতেই, সে বলিল,—"চল, আজ তোমাকে একটা বিচিত্র ঘটনা দেখাবো।"

ডাক্তার আমাকে সঙ্গে লইয়া একটা ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দরজা খুলিতেই দেখিলাম, এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে একখানি কাঠের চেয়ারে বসিয়া আরসিতে অনবরত নিজের মুখ দেখিতেছে। স্ত্রীলোকটীর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর হইবে; তথাপি দেখিতে বেশ সুশ্রী।

আমাদের দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের কোণ হইতে একটি বস্ত্রাচ্ছাদন লইয়া সযত্নে তাহার মুখ ঢাকিল। পরে মাথা নাড়িয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া আমাদের সম্মুখীন হইল।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কেমন আছেন?"

স্ত্রীলোকটী গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "বড়ই খারাপ; মুখের দাগগুলো দিন দিন বাড়ছে!"

"কই না; এ কথা আপনাকে কে বল্লে? আমি ত কিছুই দেখছিনা। আপনি নিশ্চয়ই ভুল বলছেন।"

স্ত্রীলোকটী আরও নিকটে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "না, আমি ঠিকই বলছি। আজ সকালে উঠে দেখি, আরও দশটা দাগ বেড়ে গেছে, ডান গালে তিনটে, বাঁয়ে চারটে ও কপালে তিনটে। ডাক্তার বাবু, এ হ'ল কি? এখন লোকের কাছে মুখ দেখাই বা কি করে? আমার ছেলের সামনেও বেরুতে আমার লজ্জা করবে। চিরদিনের জন্যে আমার মুখ বিকৃত হয়ে গেল!"

এই বলিয়া সে চেয়ারে বসিয়া ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। ডাক্তার তাহার পাশে অপর একখানি চেয়ারে বসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল, "আচ্ছা, আমাকে দেখতে দিন; আমি শীঘ্র আরাম করে

দেব। একটু ওষুধ দিলেই সব দাগ কোথায় মিলিয়ে যাবে।"

সে মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল। ডাক্তার তাহার মুখ হইতে আচ্ছাদনটা খুলিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু সফল হইল না। সে দুই হাতে এত দৃঢ় ভাবে সেটা চাপিয়া ধরিল যে, নখাঘাতে স্থানে স্থানে আচ্ছাদনটি ছিঁড়িয়া গেল।

ডাক্তার অনুনয়বিনয় করিয়া বলিল, "আপনি কেন এত কাতর হচ্ছেন? আপনি ত জানেন, আমি পূর্ব্বে কতবার আপনার মুখের দাগ মিলিয়ে দিয়েছি; কেউ তা টেরও পায়নি। আমাকে না দেখালে, আমি ওষুধ দেব কেমন করে?"

"আপনাকে দেখাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আপনার সঙ্গে আজ যে অন্য এক জন ভদ্রলোক রয়েছেন।"

"ওঃ, উনি! উনিও একজন ডাক্তার; আমার চেয়ে ভাল ডাক্তার। ইনি খুব ভাল ওষুধ বলে দিতে পারবেন।"

স্ত্রীলোকটী তখন তাহার মুখ অনাবৃত করিল; কিন্তু আমরা তাহার দিকে তাকাইয়া আছি বুঝিয়া, সে চঞ্চল হইয়া উঠিল, ভয়ে ও লজ্জায় তাহার মুখ

লাল হইয়া গেল। সে দৃষ্টি নত করিয়া বসিয়া রহিল এবং আমাদের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য একবার ডাইনে একবার বামদিকে মাথা নাড়িতে লাগিল।

"এ অবস্থায় আপনারা অমন করে আমাকে দেখছেন, আমার ভারি লজ্জা করছে। আমি দেখতে বোধ হয় ভয়ঙ্কর বিশ্রী হয়ে গেছি, সত্যি নয় কি?"

আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তাহার মুখে কোথাও এতটুকু দাগ দেখিতে পাইলাম না। অবনত দৃষ্টিতেই আমার দিকে ফিরিয়া সে বলিল, "মশাই, আপনি সব জানেন না, নতুন লোক; ডাক্তার বাবুকে সব ঘটনা খুলে বলেছি। আমার ছেলের অসুখের সময় তার সেবা করতে গিয়ে আমারও সেই সাঙ্ঘাতিক রোগ হয়। তাকে বাঁচিয়েছি বটে, কিন্তু আমি জন্মের মত হতশ্রী হয়ে গেছি। যাক্, তাতে আমার দুঃখ করবার কোনও কারণ নেই; আমি আমার কর্ত্তব্যই পালন করেছি। আমার দেহের সমস্ত সৌন্দর্য্য, সুষমা,—সব তাকে দিয়ে তার বিনিময়ে স্বেচ্ছায় নিজের এই সর্ব্বনাশ বরণ করে নিয়েছি। কিন্তু বড় কষ্ট, এ যন্ত্রণা অসহ্য! আমি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারছি না!"

স্ত্রীলোকটি তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে

ডাক্তার তাহার জামার পকেট হইতে ছবি আঁকিবার একটি সরু ব্রুস বাহির করিয়া বলিল, "আসুন, আমি সব আরাম করে দিচ্ছি।" সে তাহার ডান গাল বাড়াইয়া দিল। ডাক্তার গম্ভীরভাবে গালের উপর এমন করিয়া ব্রুস ঘসিতে আরম্ভ করিল, যেন যথার্থ ই মুখ হইতে দাগগুলি তুলিয়া দিবার জন্যই সে প্রাণপণ যত্নে ঔষধ লাগাইতেছে। পরে তাঁহার বাম গালে ও কপালে একই ভাবে ব্রুস ঘর্ষিয়া দিয়া কহিল, "এবার আরসিতে মুখ দেখুন দেখি, আর কিছুই দেখতে পাবেন না। সব মিলিয়ে গেছে!"

আরসি তুলিয়া লইয়া গভীর মনোযোগের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সে মুখ দেখিতে লাগিল। পরে অতি সামান্য একটু দাগ ধরিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াও যখন ব্যর্থমনোরথ হইল, তখন হাসিতে হাসিতে আরামের সহিত এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। "না, আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। আঃ বাঁচলাম! আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মশাই।"

(২)

ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইল। আমরা হতভাগিনীর প্রতি যথারীতি সম্মান দেখাইয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিলাম। ডাক্তার ঘরের দরজা ভেজাইয়া দিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল, "বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়? এঁর জীবনের ইতিহাস এবার তোমাকে বলছি, শোন।

"এঁর নাম হচ্ছে অনিমা; এক সময়ে ইনি অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন; পুরুষের নিকট প্রণয়ের ছল করিতেও ইহার খুব দক্ষতা ছিল। অনেকেই ইহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ছিলেন। জীবনটাকে পুরাপুরি মাত্রায় ভোগ করিবার একটা প্রবল ইচ্ছা এঁর মনে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল!

যে সব স্ত্রীলোক জীবনে কেবল সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা লইয়াই ব্যস্ত, যৌবনের রূপরাশি আজীবন সমভাবে রক্ষা ও ভোগ করিবার চেষ্টা করাই যাহারা জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ব'লে বিবেচনা করে, ইনিও তাদের মধ্যে একজন। হাত, মুখ প্রভৃতি শরীরের যে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সদা সর্ব্বদাই লোক-চক্ষুর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারই প্রসাধন লইয়া তিনি সমস্তক্ষণ ব্যাপৃত থাকিতেন।

ইনি একজন ধনী বিলাতফেরত ডাক্তারের কন্যা, পরে ব্যারিষ্টারের পত্নী হন। বিদেশী আদব-কায়দার

মধ্যেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয়। কি পিতৃগৃহে, কি পতির আলয়ে, সে সমাজের চালচলন, হাবভাব দস্তুরমত শিক্ষা করিবার সুযোগ ইঁহার যথেষ্টই ঘটিয়াছিল। ইঁহার স্বামী একটি শিশু পুত্র রাখিয়া হঠাৎ একদিন মারা যান। পিতামাতা তৎপূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারিনী হওয়ায় স্বামীবিয়োগে ইঁহাকে সংসার একেবারে অন্ধকার দেখিতে হয় নাই। অবশ্য দ্বিতীয়বার আর বিবাহ করেন নাই বটে, কিন্তু ও সমাজের বিধবারা যেরূপ আমোদ আহ্লাদে দিন কাটায়, ইনিও সে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহোক, পুত্রটিকে ইনি ভালবাসিতেন এবং বেশী মাহিনায় এক ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া তাহার লালনপালন সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্তই হইয়াছিলেন।

পুত্রটি দিন দিন বাড়িতে লাগিল, ইনিও যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইলেন। কিন্তু সাজসজ্জা ও দেহের প্রসাধনের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায়ই বা তদপেক্ষা বেশী আসক্তি জন্মিতে লাগিল। যৌবনের সৌন্দর্য্য ও সুষমা যতই বিলীন হইতে চলিল, ইনি জোর করিয়া তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। মানুষের স্বভাবই এই যে, যে জিনিষটার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সেইটাকে

সে জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। প্রত্যহ প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া দর্পণে মুখ দেখিতেন, অঙ্গসৌষ্ঠব বিশেষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেন। একদিন দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হঠাৎ তিনি চমকিয়া উঠিলেন, 'এ কি! চোখের কোলের মাংসপেশী হঠাৎ কুঞ্চিত হইল কবে? দুদিন পরে ত আরও বেশী কুঞ্চিত হইয়া উঠিবে! এ সব কি এখন রোধ করিবার কোনও উপায় নাই?' আসন্ন বার্দ্ধক্য ইতিমধ্যেই তাঁহার পুষ্পপেলব দেহের উপর যে সব ভীতিপ্রদ উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া আতঙ্কে ইঁহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিত। প্রতিদিন যে কতবার অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে ইনি ঘরে ঢুকিয়া অর্গল বদ্ধ করিয়া দর্পণে লীলাময়ী প্রকৃতির এই ধ্বংসকার্য্য নিরীক্ষণ করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই; তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িত। দেহের এ সমস্ত ঘৃণিত পরিবর্ত্তন এখন স্পষ্ট সাধারণ লোক-চক্ষুর দৃষ্টিগোচর না হইলেও, তাঁহার তীব্র দৃষ্টির নিকট ত আর গোপন থাকিতে পারিতেছে না। আসন্ন বিপদের কৃষ্ণ ছায়া যে ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, তাহা যে তাঁহার মুখে স্পষ্টই ব্যক্ত রহিয়াছে! দর্পণও যেন এইসব ঘৃণ্য কথা চুপি চুপি তাঁহার কর্ণগোচর করিতেছে; সেও যেন তাঁহার বিপদ দেখিয়া হাসিতেছে, বিদ্রূপ করিতেছে এবং

ভবিষ্যতে যাহা-কিছু ঘটিবে তাহা যেন এখনই তাঁহার নিকট মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে! সে সময় ইঁহার বক্ষ-পঞ্জর ভেদ করিয়া হৃদয়-বিদারক দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইত।

এ অব্যক্ত যন্ত্রণা যখন বড়ই অসহ্য হইত, ইঁহার মস্তিষ্ক তখন বিকৃত হইয়া উঠিত। মেজের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎপাতার নিকট করুণ অভিযোগ উপস্থিত করিতেন, তাঁহার এই সর্ব্বগ্রাসী চিরন্তন নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতেন,—'বার্দ্ধক্য যন্ত্রণা যদি এতই কষ্টকর, তবে কেন যৌবনের সুখরাশির লোভ দেখাইয়াছিলে? যদি এত শীঘ্রই এ তুচ্ছ রূপরাশি কাড়িয়া লইবে, তবে কে তোমাকে ইহা দিবার জন্য সাধিয়াছিল? সকলের জন্যও না পার, অন্ততঃ আমার জন্য তোমার এই সর্ব্বনেশে নিয়মটার একটু ব্যতিক্রম কর। অভাগিনীর প্রতি একটু কৃপা দেখাও, যেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যৌবনের এই রূপ-মাধুর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে!' পরে সেই নিষ্ঠুর দত্তাপহারকের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করা বৃথা বুঝিয়া, মানসিক যন্ত্রণায় মেজের উপর শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতেন, আর নৈরাশ্যব্যঞ্জক মৃদু চীৎকারধ্বনি ইঁহার ওষ্ঠাধরে কম্পিত হইয়া উঠিত।

(৩)

এ সব দারুণ যন্ত্রণা তাঁহাকে প্রতিদিন নূতন ও অধিকতর ভাবে সহ্য করিতে হইয়াছে। শেষে একদিন এঁর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ, পুত্রের হঠাৎ অসুখ হয়। ছেলেটির বয়স তখন বছর পনর। ডাক্তার প্রথমে অসুখটা ঠিক ধরিতে পারে নাই।

পুত্রের ধাত্রী দিনরাত তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সে রোগীর শয্যা ত্যাগ করিয়া খুব কমই বাহির হইত। ইনি কেবল সকাল সন্ধ্যা দুইবার পুত্রের সংবাদ লইয়া যাইতেন। প্রাতে সুচারু বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া চতুর্দ্দিক সুগন্ধে আমোদিত করিতে করিতে ইনি দরজার নিকট আসিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'বিমল, আজ একটু ভাল ত?'

প্রবল জ্বরের উত্তাপে বালকের মুখ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। সে ক্ষীণস্বরে উত্তর করিত, 'হা, মা, আজ একটু ভাল।' ইনি কিয়ৎক্ষণ রোগীর ঘরের মধ্যে ঔষধের শিশি বোতলের দিকে ভীতনেত্রে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। হঠাৎ 'ও, একটা বিশেষ দরকারী কাজ ভুলে গেছি যে!' এই বলিয়া সসঙ্কোচে সে স্থান

ত্যাগ করিতেন। তাঁহার বসনাঞ্চল হইতে নিঃসৃত ফোটা ফুলের সৌরভে ঘরটা ভরপূর হইয়া যাইত।

সন্ধ্যায় বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতে তাঁহার প্রত্যহই দেরী হইত। তখন তাড়াতাড়ি কর্ত্তব্যের অনুরোধে একবার রোগীর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'ডাক্তার সাহেব আজ কি বলে গেলেন?'

'তিনি এখনও রোগ ঠিক ঠাওরাতে পারছেন না।'

কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় ইঁহার সম্মুখেই ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'আপনার পুত্রের দেখছি বসন্ত রোগের সূত্রপাত। খুব সাবধানে রাখবেন।'

ইঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইনি ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে বেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতে ধাত্রী তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া ধূপ-ধুনার গন্ধ পাইল। দেখিল, কর্ত্রীঠাকুরাণী জাগ্রত অবস্থায় শয্যায় শুইয়া রহিয়াছেন। ভীষণ যন্ত্রণায় তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে। অনিদ্রায় তাঁহার সুন্দর বদনমণ্ডল পাংশু হইয়া গিয়াছে।

'বিমল কেমন আছে?'

'না, মা আজ বড় ভাল নয়।'

শয্যা ত্যাগ করিয়া ইনি ডিমসিদ্ধ ও এক পেয়ালা চা পান করিলেন। পরে বসন্ত রোগের প্রতিরোধক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধের সন্ধানে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাহির হইলেন।

আহারের পূর্ব্বে ধাত্রীর নিকট সংবাদ লইয়া জানিলেন, পুত্রের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছে। ডাক্তারও বড় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন; শুনিয়াই ইনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। পুত্রের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। আহার আর তাঁহার মুখে রুচিল না। সারারাত্রি বিছানায় শুইয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। পরদিন ভোর বেলায় দাসীকে পুত্রের সংবাদ লইতে পাঠাইলেন; কিন্তু সংবাদ আদৌ আশাপ্রদ নহে। তিনি সমস্তদিন ঘরে খিল আঁটিয়া বসিয়া রহিলেন; ঘরের ভিতর নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য অবিশ্রান্ত পুড়িতে লাগিল।

এক সপ্তাহ এই প্রকারেই কাটিল। ইনি গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন না। কেবল বিকালে একবার ঘণ্টা-খানেকের জন্য বেড়াইয়া আসিতেন। এখন প্রতি ঘণ্টায় পুত্রের সংবাদ লন এবং অশুভ সংবাদ পাইলেই ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে থাকেন।

এগার দিনের দিন ধাত্রী একবার রোগীকে দেখিবার জন্য ইঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইল। কিছুক্ষণ পরে আবার

নিজেই ইঁহার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া কাতরভাবে বলিল, 'আপনার পুত্রের অসুখ খুবই বেড়েছে। সারাদিন যন্ত্রণায় ছটফট করছে, আপনাকে একবার দেখতে চায়।'

ইনি মুখে হাত ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নিরুত্তর দেখিয়া ধাত্রী পুনর্ব্বার বলিল, 'ডাক্তার তাহার আরোগ্য লাভের আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছেন; বিমল আপনার দর্শনের প্রতীক্ষা করে আছে। আমি আর দেরী করতে পারি না, চল্লুম; আপনি একটু পরে যাবেন।' উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

ঘণ্টা দুই পরে বালক তাহার মৃত্যু সন্নিকট বুঝিতে পারিয়া পুনর্ব্বার মাকে দেখিবার জন্য কাতর হইল। ধাত্রী তখন ইঁহাকে আবার খবর দিতে আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তিনি অনবরত কাঁদিতেছেন ও জোড় হস্তে বিড়বিড় করিয়া বলিতেছেন,—'ভগবান, আমাকে ক্ষমা কর। আমি যেতে পারবো না। আমার সাহস হয় না; বড় ভয় করছে।'

ধাত্রী ইঁহাকে মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা দিতে বিশেষ চেষ্টা করিল। পরে তাহার মত লওয়াইতে অসমর্থ হইয়া ইঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। পরন্তু বলপ্রয়োগ করায় উদ্বেগ ও

আতঙ্কে ইহাঁর ঘন ঘন হিষ্টিরিয়ার ফিট্‌ হইতে লাগিল। কয়েক ঘণ্টা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন।

(৮)

রাত্রে ডাক্তার আসিয়া ধাত্রীর মুখে এ সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আপনি আবার যান; বলুন যে আমি ডাকছি; স্বেচ্ছায় না আসেন, যেমন করে পারেন জোর করে টেনে আনবেন। ছেলেটার কষ্ট দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে: মরবার আগে একবার মাকে দেখতেও পাবে না!'

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ধাত্রী ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ইহাকে পুত্রের শয্যাপার্শ্বে টানিয়া আনিবার জন্য হাত ধরিল, কিন্তু ইনি এত জোরে ঘরের দরজা জড়াইয়া ধরিলেন যে, সে কিছুতেই তাহা ছাড়াইতে পারিল না, শেষে ঘৃণাভরে ইহার হাত ছাড়িয়া দিল। ইনি তখন মান সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়া একেবারে তাহার পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, 'আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ভীরু, দুর্ব্বল; আমার সাহসে কুলাচ্ছে না। সে নিশ্চয়ই মরবে না। আমি সবিনয় অনুরোধ করছি আপনারা তাকে গিয়ে বলুন, আমি তাকে খুবই ভালবাসি; কিন্তু কাছে যেতে সাহস হচ্ছে না।'

বালকের যন্ত্রণার তখন আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। জীবনের একমাত্র অবলম্বন, তাহার জননীকে একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না। মুমূর্ষু বালকেরও মনে ক্ষণিকের জন্য বৃদ্ধের ন্যায় জ্ঞানের উদয় হইল। সে জননীর অনুপস্থিতির কারণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়া বলিল,—'তিনি যদি ভেতরে আসতে ভয় পান, তাঁকে বলুন আমার জানালার পাশে এসে একবার যেন দাঁড়ান; তাঁকে শেষ স্পর্শ করতে না পাই, অন্ততঃ একবার চোখে দেখেও যেন মরতে পারি।'

ধাত্রী পুনর্ব্বার ইঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া এ কথা জানাইল। 'আপনার কোনও ভয় নাই; মাঝখানে অনেকটা ব্যবধান থাকবে।' ইনি এ প্রস্তাবে আর সম্মত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত হইয়া এসেন্সের শিশির ঘ্রাণ লইতে লইতে বারান্দার উপর দু'এক পদ চলিতে না চলিতেই হঠাৎ হাতে মুখ ঢাকিয়া তীব্র যন্ত্রণাধ্বনি করিয়া উঠিলেন,—'না, না, আমি কেমন করে যাবো; আমার বড় লজ্জা করছে; ভয়ে শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠছে। আমি কিছুতেই যেতে পারবো না।'

ধাত্রী ইঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা

করিল। কিন্তু ইনি বারান্দার একটা লৌহস্তম্ভ প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া এমন করুণস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন যে, রাস্তার লোকেরা দাঁড়াইয়া উপরদিকে তাকাইয়া দেখিল। সে সময় ডাক্তারও বাহিরে আসিয়া ইহাকে বুঝাইতে কত চেষ্টা করিলেন, কত সাধ্যসাধনা করিলেন, কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল।

মুমূর্ষু বালক বড় আশায় তাহার সজল নেত্রদ্বয় জানালার দিকে ফিরাইয়া জননীকে শেষ একবার দেখিবার জন্য উদ্বিগ্ন ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সে অনেকক্ষণ সেদিকে তাকাইয়া রহিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। তখন নিরাশান্তঃকরণে সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। আর একটি কথাও উচ্চারণ করিল না। ধাত্রী ও ডাক্তার কেহই তাহার মুখের দিকে আর তাকাইতে সাহস করিল না।

ভোরের পাখীর প্রভাতীগানের সহিত বালকের শেষ প্রাণবায়ু মিশাইয়া গেল। পরদিনই ইনি উন্মত্ত হন।”

* * * * *

যে মাতৃবক্ষে সন্তানের হিতার্থে সঞ্জীবন স্নেহরস স্বতঃই সহস্রধারে প্রবাহিত, যে স্নেহের আদি নাই, অন্ত নাই,

যে স্নেহের অযাচিত দানেই তাহার গৌরব ও সার্থকতা, যে স্নেহ প্রতিদান চাহে না, মান অপমানের অপেক্ষা রাখে না, লোকলজ্জা গ্রাহ্য করে না, কুশিক্ষার ফলে তাহা কিরূপ পাষাণের ন্যায় শুষ্ক হইয়া যায় ও সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি কঠোর, এ হতভাগিনীর জীবনই তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন। আমাদের স্ত্রীসমাজে বিকৃত শিক্ষা কিরূপ কুফল প্রসব করিতে পারে, তাহার চিন্তাতেই অভিভূত হইয়া আমি সেদিন গৃহে ফিরিলাম।

সবুজ চক্ষু।

(১)

"মৃগটা আহত হয়েছে,—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পর্ব্বতগাত্রস্থ বৃক্ষপত্রে রক্তের দাগ লেগে আছে। বনপথে লাফাতে লাফাতে ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবসন্ন হয়ে পড়েছে। যুবরাজ অল্প বয়সেই শিকার-কৌশলে দক্ষ হয়ে উঠেছেন দেখছি। আর কেহ বহু বৎসর মৃগয়ায় রত থেকেও এমন স্থিরলক্ষ্য হতে পারে না। চল্লিশ বৎসর আমি এই পাহাড়ে শিকার করে বেড়াচ্ছি, কিন্তু এরূপ অব্যর্থ লক্ষ্য আমি আর কখনও দেখিনি। কিন্তু সাবধান, হরিণটাকে ঐ শালগাছের পাশ দিয়ে যেতে দিও না। খুব জোরে শিঙ্গা বাজাও; জুতার ঠোকর দিয়ে ঘোঁড়াগুলোকে উত্তেজিত কর। দেখতে পাচ্ছ না, হরিণটা শালবৃক্ষবেষ্টিত ঝরণার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ওখানে যাবার আগেই ওকে ধরতে হবে, তা না' হ'লে আমাদের সকল আশাই নির্ম্মূল হবে।"

রাজার প্রধান শিকারীর এই আদেশ শুনিয়া, অধীনস্থ শিকারীগণ নবোৎসাহে মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল।

শিঙ্গার শব্দে, শিকারী কুকুরের চীৎকারে, ও অশ্বের পদধ্বনিতে পর্ব্বতগুহা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

তাহাদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। দ্রুতগামী কুকুরেরা শরকুঞ্জের নিকট আসিয়া দেখিল, পরিশ্রান্ত মৃগ ইতিমধ্যেই তীরবেগে ছুটিয়া গিয়া নির্ঝর পার্শ্বস্থ সঙ্কীর্ণপথের সীমাস্থিত কুঞ্জবনের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।

প্রধান শিকারী চীৎকার করিয়া উঠিল,—"দাঁড়াও দাঁড়াও, আর অগ্রসর হয়ো না। দেখছি ভগবানের ইচ্ছা নয় যে, আমরা মৃগটাকে বধ করি।"

শিকারীরা থামিয়া গেল। শিঙ্গাধ্বনি নীরব হইল। কুকুরেরাও আদিষ্ট হইয়া অনিচ্ছায় ফিরিয়া আসিল।

এমন সময় যুবরাজ অশ্বারোহণে আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

তিনি রাগান্বিত ভাবে প্রধান শিকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছে? সব চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন?" তাঁহার মুখে ক্রোধের চিহ্ন সম্যক পরিস্ফুট। তাঁহার চক্ষু-দিয়া অগ্নিকণা নির্গত হইতেছে। "একি, তোমরা ক'চ্ছ কি? দেখতে পাচ্ছ না প্রাণীটা আহত হয়েছে। এই প্রথম প্রাণী আমার শরে আহত হলো, আর তোমরা তার অনুসরণ না করে দাঁড়িয়ে রয়েছ! মৃগশিশু বনের ভিতর

গিয়ে মরে থাকবে, এ বুদ্ধি তোমাদের মাথায় যোগাল না ? তোমাদের জানা উচিত যে, আমি হরিণ শিকার করতে এসেছি, বাঘ ভালুককে মৃত হরিণ খাওয়াতে আসি নাই।"

প্রধান শিকারী থতমত খাইয়া বলিল, "যুবরাজ! ইহার পশ্চাদ্ধাবন করা এখন অসম্ভব।"

"অসম্ভব! কেন?"

"এই বনপথ এক ঝরণার পাশে গিয়ে পড়েছে। সেই ঝরণার জলের ভেতর এক রাক্ষসী বাস করে। মৃগটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে সেই ঝরণার পাশে গিয়ে পৌঁছেছে; সে অবধি তার পশ্চাদ্ধাবন করলে বিপদ নিশ্চিত।"

"তা বলে মৃগটাকে ছেড়ে দেব! কখনই না। বরং পৈতৃক রাজত্বও ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু আজ শিকারের প্রথম দিন যে জন্তু আমার শরে আহত হয়েছে তা'কে কিছুতেই ছাড়তে পারি না। দেখতে পাচ্ছ না? মৃগটাকে এখনও এক একবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে পড়েছে; আর দৌড়তে পারছে না। যাই; আমার ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দাও। আমাকে বাধা দিলে, তোমায় মাটিতে ফেলে তার ওপর ঘোড়া চালিয়ে চলে যাব। হয় ত বা ও নির্ঝরের পাশে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি ওর নাগাল ধরতে পারব। আর যদিই বা

এর মধ্যে সে ঝরণার কাছে গিয়ে পৌছিয়ে থাকে, তাহলেই বা ভয় কি?" পরে তাঁহার অশ্বকে উত্তেজিত করিয়া বলিলেন, "চল্, আমাকে ওর কাছে শীঘ্র নিয়ে যেতে পারলে তোর গলায় আমি হীরার হার পরিয়ে দেব।"

যুবরাজ অশ্বারোহণে ঝড়ের ন্যায় বেগে চলিয়া গেলেন।

যতক্ষণ দেখা গেল প্রধান শিকারী যুবরাজের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পরে যুবরাজ ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলে, সে তাহার চতুষ্পার্শ্বে একবার তাকাইল। পার্শ্বস্থ সকলেই তাহার ন্যায় নীরব নিশ্চল ও বিস্ময়াভিভূত হইয়া দাড়াইয়া রহিল।

প্রধান শিকারী তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তোমরা দেখলে ত? আমি যুবরাজকে যথাসাধ্য বাধা দিয়েছি, শেষে আমাকে প্রাণনাশের ভয় দেখিয়ে চলে গেলেন। আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি। অসমসাহসী হলেও সে রাক্ষসীকে দমন করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। শিকারীরা তীরধনু নিয়ে এই পর্য্যন্ত আসতে পারে, কিন্তু কেবল যারা ভূতের মন্ত্র জানে, তারাই ঝরণার মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হতে সমর্থ হয়।"

(২)

"আপনাকে বড়ই বিমর্ষ দেখাচ্ছে। দিন রাতই মৌন হয়ে বসে আছেন। আপনার কি হলো? যেদিন থেকে আপনি সেই আহত হরিণের অনুসরণে ঝরণার নিকট গিয়াছিলেন, সেই দিন থেকেই আপনার মনের ভাব একেবারে বদলে গেছে। মনে হয় কোন রাক্ষসী আপনাকে মায়ার দ্বারা মুগ্ধ করেছে। আপনি আর শিকারী কুকুরদের সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে মৃগয়ায় যান না; আপনার শিঙ্গাধ্বনি আর গিরিগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হয় না। প্রত্যহ প্রাতঃকালে তীরধনু নিয়ে আপনি একাকী যাত্রা করেন, শালকুঞ্জের মধ্যে নির্জ্জনে বসে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেখানে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকেন। সন্ধ্যার* তিমির-পুঞ্জে ধরাতল আচ্ছন্ন হলেই, আপনি বিষণ্ণ মুখে ধীর পদবিক্ষেপে প্রাসাদে ফিরে আসেন; আমি কত আশা করে বসে থাকি, আপনি হয় ত শিকারলব্ধ জন্তু সঙ্গে করে আনবেন, কিন্তু আমার সব আশাই নিষ্ফল হয়। কেনই বা আপনি প্রিয়জনদের নিকট হতে দূরে থেকে একাকী সময় অতিবাহিত করেন, বুঝতে পারি না।"

প্রধান শিকারী যুবরাজকে সম্বোধন করিয়া এই কথাগুলি বলিল।

যুবরাজ গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া পার্শ্বস্থ একটি চারাগাছের

ডাল কাটিতেছিলেন। এই কথায় আদৌ কর্ণপাত করিলেন না; কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর যুবরাজ প্রধান শিকারীর দিকে মুখ ফিরাইয়া এরূপ ভাবে কথা বলিলেন, যেন তিনি পূর্ব্বকথিত কথার একটি বর্ণও শুনেন নাই।

"তুমি ত বৃদ্ধ হয়েছ, এই পাহাড়ের সমস্ত গহ্বরই তোমার পরিচিত। এই পাহাড়ের পাদদেশে বন্যজন্তুর শিকারে বহুকাল অতিবাহিত করেছ। বলতে পার, কখন কি এই পাহাড়ের অধিবাসিনী এক রমণীকে দেখেছ?"

"রমণী!" এই কথা বলিয়া প্রধান শিকারী বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"হাঁ, রমণী! এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছে—মনে করে-ছিলাম এ ব্যাপার চিরকালের জন্যই গুপ্ত রাখব, কিন্তু এখন দেখছি তা অসম্ভব। আমার অন্তরে দিনরাত দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। দেখতে পাচ্ছ আমার মুখের ভাবও সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেছে। তোমাকে সব ঘটনা খুলে বলি, শোন। তুমি চেষ্টা করলে এ অদ্ভুত রহস্য-উদঘাটনে আমাকে সাহায্য করতে পার। তবে তাকে আর কেউ চক্ষে দেখেছে কি না, বা তার সম্বন্ধে কেউ কোন সংবাদ দিতে পারবে কি না সন্দেহ।"

প্রধান শিকারী গম্ভীর হইয়া যুবরাজের আরও নিকটে সরিয়া বসিল।

যুবরাজ আবার বলিতে লাগিলেন,—"যেদিন তোমার কথা না শুনে নির্ঝর পর্য্যন্ত আমি সেই মৃগের অনুসরণ করেছিলাম, সেই দিন থেকে সর্ব্বদাই আমার নির্জ্জনে থাকতে বড় ইচ্ছা হয়। সে স্থানটি বোধ হয় তোমার পরিচিত নহে। একবার কল্পনানেত্রে ভাব, নির্ঝরটি পাহাড়ের এক গহ্বরের মধ্যে অবস্থিত। নির্ঝরের জল চতুষ্পার্শ্বস্থ চারাগাছের পাতাগুলিকে ভাসিয়ে সুবর্ণ গোলক-বৎ সমতল তৃণভূমির উপর ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে। তারপর শীর্ণ স্রোতের আকারে বালুকারাশির উপর দিয়ে সুমিষ্টতান তুলে বয়ে যাচ্ছে; সে তান ফোটাফুলের উপর বসন্তে উদ্যত মৌমাছির গুণ-গুণ স্বরের ন্যায় শ্রুতি-মধুর। সেই স্রোত যেন হাসতে হাসতে গান গাইতে গাইতে নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে নেচে নেচে চলেছে! শেষে পাহাড়ের মধ্যে এক হ্রদে গিয়ে পড়েছে। সেই পাহাড় গাত্রে বসে ব্যথিত অন্তঃকরণে আমি জলের মৃদুধ্বনি শুনি। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সান্ধ্যসমীরণ প্রবাহেও ঐ হ্রদের জল বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না।

"সে স্থানের সর্ব্বত্রই গম্ভীরতা বিরাজমান। নির্জ্জনতা

তার সহস্র সহস্র অবোধগম্য শব্দ নিয়ে সেই স্থানের উপর আধিপত্য করছে। এ দৃশ্যে দর্শকের মনে স্বতঃই গভীর বিষাদের সঞ্চার হয়। মনে হয় যেন, শালবৃক্ষের পত্রছায়া, পাহাড়ের অন্ধকারময় গহ্বর ও হ্রদের জল হইতে প্রকৃতি দেবীর অশরীরী আত্মা আমাদের সঙ্গে কথা কইছে।

প্রত্যুষে যখন আমি তীর ধনুক নিয়ে নির্ঝরের দিকে যাত্রা করি, তোমরা হয়ত মনে ক'র আমি শিকারের অন্বেষণে যাচ্ছি। কিন্তু তা নয় আমি হ্রদের তীরে গিয়ে বসে জলের দিকে তাকিয়ে থাকি। কেন থাকি শুনতে চাও? তা, কিন্তু ঠিক জানি না। বোধ হয় এ একটা পাগলামি। প্রথম যে দিন অশ্বারোহণে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম, হ্রদের গভীর জলের মধ্যে এক আশ্চর্য্য জিনিষ দেখেছিলাম,—স্ত্রীলোকের দুটি চক্ষু।

"হয় ত দেখতে ভুল হয়ে থাকবে; সে চক্ষু নয়, বোধ হয় সূর্য্যের রশ্মি জলের ভিতর প্রবেশ করেছিল। কিংবা হয়ত যে সব ফুল জলেই ফুটে জলের মধ্যে ভাসতে থাকে,যাদের পুষ্প-কোষ মরকতের ন্যায় উজ্জ্বল, সেই দুটা ফুলই দেখেছিলাম, তা ঠিক করে বলতে পারি না। যাই হোক্ না কেন, আমার মনে হল, যেন সে চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ। সেই দৃষ্টিই আমার মনের মধ্যে এক প্রবল ইচ্ছা জাগিয়ে

তুলেছে ; সে চক্ষুর ন্যায় যার চক্ষু, এমন স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ লাভ করতে আমি বড়ই উদগ্রীব হয়ে পড়েছি। যদিও মনে বেশ বুঝতে পারছি যে, সে ইচ্ছা জীবনে কখনও পূর্ণ হবে না।

"এই অভিলাষ পূরণ করবার মানসে আমি প্রত্যহই সেই জায়গায় গিয়ে থাকি।

"শেষে একদিন সন্ধ্যায়,—আমার মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখছি, কিন্তু তা নয় সত্য ঘটনা—এখন তোমার সঙ্গে যেমন কথা কচ্ছি, তার সঙ্গে ঠিক তেমনি ভাবেই কথা কয়েছিলাম—দেখলাম হ্রদের তীরে এক অনিন্দ্যসুন্দরী রমণী বসে রয়েছে। তার পরিধানের নীল শাড়ির অঞ্চল হ্রদের জলের উপর পড়ে ভাসছে। তার কেশরাশি সোণালী রংয়ের ; তার চোখের লোমগুলি অগ্নিকণার মত জ্বলছিল ; তাদের ভেতর থেকেই সেই চঞ্চল চক্ষু দু'টি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। রমণীর সেই চক্ষুর্দ্বয় সদাই আমার মানস-নেত্রে ভেসে বেড়াচ্ছে। সে চোখের রং বর্ণনাতীত, চোখদুটি দেখতে—"

প্রধান শিকারী বিবর্ণ মুখে বলিয়া উঠিল, "বোধ হয় সবুজ বর্ণের।"

তাঁহার মনের কথা পূর্ব্বেই ইহাকে বলিতে শুনিয়া যুব-

রাজ বিস্মিত হইলেন। উদ্বেগ ও আনন্দ মিশ্রিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"তবে তুমি কি তা'কে চেন?"

"না, না, ভগবান করুন, তাকে যেন কখন চিনতে না হয়। আমার পিতা আমাকে হ্রদের কাছে যেতে নিষেধ করবার সময় অনেক বার বলেছিলেন যে, ঐ জলের মধ্যে যে প্রেতাত্মা, ভূত, সয়তান বা স্ত্রীলোক বাস করে, তার চোখের রং ঠিক ঐ রকম। পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা আপনার যা প্রিয়, তা'র শপথ করে অনুরোধ করছি, আর সেই শালবৃক্ষ-বেষ্টিত নির্ঝরের নিকট যাবেন না। একদিন না একদিন, আপনাকে সেই রাক্ষসীর বিদ্বেষের পাত্র হতে হবে এবং সে স্থানের শান্তিভঙ্গ করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে।"

যুবরাজ দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"পৃথিবীতে সব চেয়ে যা বেশী ভালবাসি, তার দিব্যি দিচ্ছ!"

"হাঁ, আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের, আপনার পিতামাতার, আপনার এই দাসের,—যে আপনাকে ভূমিষ্ঠ হতে দেখেছে, —এই সবার দিব্য—"

"তুমি কি জান, এখন আমি পৃথিবীতে সব চেয়ে কি বেশী ভালবাসি? তুমি কি জান, কিসের জন্য আমি পিতার ভালবাসা, জননীর অগাধ স্নেহ, আমাকে বিবাহ করতে

ইচ্ছুক শত শত রমণীর আদর যত্ন, সব ত্যাগ করতে পারি ? কেবল মাত্র সেই চক্ষুর্দ্বয়ের একটি দৃষ্টির বিনিময়ে। আমি কেমন করে প্রতিজ্ঞা করি যে, সেই চক্ষুর্দ্বয়ের অন্বেষণ হতে বিরত থাকবো ?”

যুবরাজ এরূপ করুণভাবে কথাগুলি বলিলেন যে, তাহা শুনিয়া প্রধান শিকারীর চক্ষু দিয়া বড় বড় অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল। সে দুঃখ-বিগলিত কণ্ঠে কেবল বলিল,—“ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।”

(৮)

“তুমি কে ? তোমার বাসভবন কোথায় ? প্রত্যহই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য এখানে আসি, কিন্তু তুমি কখন আস বা যাও, কিছুই বুঝতে পারি না। রাত্রির নিবিড় অন্ধকারের ন্যায় যে রহস্যময় আবরণে তুমি আচ্ছন্ন রয়েছ, সে আবরণ ক্ষণিকের জন্য মোচন কর। আমি তোমাকে যথার্থই ভালবাসি, প্রাণভরে ভালবাসি। তুমি সৎ হও, অসৎ হও, দেবী হও, সয়তান হও, আমি চিরকাল তোমারই প্রেমপাশে আবদ্ধ থাকব।”

সূর্য্য পর্ব্বত-শৃঙ্গের পশ্চাতে ডুবিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার

নিবিড় অন্ধকার রাশি দ্রুত পদবিক্ষেপে পাহাড়ের গাত্র ও তলদেশকে আচ্ছন্ন করিতে উদ্যত! নির্ঝরের পার্শ্বস্থিত বৃক্ষশ্রেণীর পত্রাবলীর মধ্যে সান্ধ্য-সমীরণ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। ঘন তিমিররাশি হ্রদবক্ষ হইতে ধীরে ধীরে চোরের ন্যায় উত্থিত হইয়া তীরস্থ ভূমিখণ্ডকে আচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যুবরাজ এক পতনোন্মুখ প্রস্তরখণ্ডের উপর দণ্ডায়মান। তাঁহার প্রতিবিম্ব হ্রদবক্ষে প্রতিফলিত হইয়াছে। তিনি সেই অনন্ত রহস্যময়ী রমণীর অলৌকিক জীবন-কথা জানিবার জন্য বৃথা তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন।

রমণী সুন্দরী,—সুন্দরী ও বিষাদম্লানা,যেন প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি। তাহার নিবিড় কেশদাম স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশ আচ্ছন্ন করিয়া বায়ু ভরে দুলিতেছে। তাহার উজ্জ্বল নয়নের নিম্নভাগ সুবর্ণময়, মরকতের ন্যায় চক্ষুর্দ্বয় জ্বল জ্বল করিতেছে।

যুবরাজ থামিলে, রমণী যেন কিছু বলিবার জন্য তাহার ওষ্ঠদ্বয় খুলিল। কিন্তু তাহার অন্তঃস্থল হইতে কেবল এক গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল। সে দীর্ঘশ্বাস অতীব ক্ষীণ, দুঃখব্যঞ্জক, যেন একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ মৃদু সমীরণে আহত হইয়া আবার জল মধ্যেই বিলীন হইয়া গেল।

যুবরাজ হতাশভাবে বলিলেন,—"তুমি উত্তর দিচ্ছ না কেন? তোমার সম্বন্ধে লোকমুখে যা শুনেছি তা' কি বিশ্বাসযোগ্য? তুমি কি আমাকে ভালবাস? আরও জানতে চাই, তুমি মানবী না প্রেতাত্মা?"

"যদি প্রেতাত্মাই হই?"

যুবরাজ মুহূর্তের জন্য ইতস্ততঃ করিলেন। তাঁহার ভ্রুযুগলের উপর শীতল স্বেদবিন্দু ঝরিতেছিল। চক্ষুর্দ্বয় প্রসারিত ও রমণীর মুখের উপর নিবদ্ধ। সেই চক্ষুর ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি প্রবল অনুরাগভরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তাহলেও আমি তোমাকে ভালবাসব। এখনও তোমাকে যেমন ভালবাসি, তখনও তেমনি বাসবো। এ জীবনের পরপারেও তোমার প্রতি আমার ভালবাসার একটুও হ্রাস হবে না।"

রমণী বীণাবিনিন্দিত স্বরে বলিতে লাগিল,—"যুবরাজ! নিজের প্রাণাপেক্ষা আমি তোমাকে বেশী ভালবাসি। এর প্রমাণস্বরূপ দেখ, আমি অশরীরী আত্মা হয়েও মানুষের প্রেমে মুগ্ধ হয়েছি। আমি পৃথিবীর সাধারণ স্ত্রীলোকের দলভুক্ত নহি, কিন্তু সাধারণ মানুষ হতে উচ্চতর যে তুমি, তোমার স্ত্রী হবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এই হ্রদের গভীর তলদেশে আমি বাস করি; ইহারই জলের ন্যায়

আমি অস্থায়ী, অশরীরী ও স্বচ্ছ। আমি জলের মৃদুতানের সহিত কথা কহি, বীচিমালা আমার ক্রীড়ার সঙ্গিনী।"

রমণীর কথা শুনিতে শুনিতে যুবরাজ তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্য-সাগরে মগ্ন হইলেন এবং এক অজ্ঞেয় শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রস্তরখণ্ডের প্রান্তের দিকে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রমণী বলিতে লাগিল,—"হ্রদের ঐ স্বচ্ছ তলদেশ দেখতে পাচ্ছ? জলের ভেতর ঐ যে বড় বড় সবুজ বর্ণ পাতাবিশিষ্ট চারাগাছ মৃদু সমীরণে এদিক ওদিক হেলছে দুলছে, দেখতে পাচ্ছ? ঐখানে গেলে তুমি এত সুখ পাবে যে, জীবনে স্বপ্নেও কখন তা ভাবতে পারনি। এত সুখ তুমি আর কিছুতেই পাবে না। এস! হ্রদ হতে উত্থিত অন্ধকার রাশি আমাদের চারদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে, আমাদের আচ্ছন্ন করছে। তরঙ্গ সকল অস্পষ্টস্বরে আমাদের ডাকছে, সমীরণ বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর ধ্বনিতে ভালবাসার গান গাচ্ছে, এস—এস!"

রাত্রির অন্ধকার চারিদিকে ঘনাইয়া আসিল। হ্রদবক্ষে চন্দ্রকিরণ প্রতিবিম্বিত হইল। জলাভূমিতে আলেয়ার আলোর ন্যায় রমণীর সবুজ চক্ষুর্দ্বয় অন্ধকারে জ্বল জ্বল করিতে লাগিল।

"এস! এস!" এই কথাগুলি মন্ত্রের ন্যায় যুবরাজের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।—"এস!" সেই রহস্যময়ী নারী-মূর্ত্তি তাঁহাকে গহ্বরের কিনারায় ডাকিয়া আনিল। তাঁহার মনে হইল যেন রমণী শূন্যে ঝুলিতেছে। সে মুখ বাড়াইয়া যুবরাজকে চুম্বন করিতে উদ্যত হইল। যুবরাজ তাহার দিকে এক পা অগ্রসর হইলেন,—আর এক পা,— তিনি অনুভব করিলেন যেন রমণীর কোমল ভুজবল্লরী তাঁহার গলদেশে বেষ্টিত রহিয়াছে; যেন সেই পাষাণমূর্ত্তি তাঁহার ওষ্ঠাধরে শীতল চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল। তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, সম্মুখে অগ্রসর হইলেন, পরে অস্ফুট যন্ত্রণাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে হ্রদের গভীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

চঞ্চল জলরাশি উজ্জ্বল বিন্দু বিন্দু আকারে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে ডুবাইয়া ফেলিল। তাহাদের রজতোজ্জ্বল চক্রাকার বাড়িতে বাড়িতে শেষে তীরে গিয়া বিলীন হইয়া গেল।

—

বিবাহের যৌতুক।

(১)

কবি বলিয়া গিয়াছেন "প্রথম যখন বিয়ে হলো, ভাবলাম বাহা বাহা রে!" আমাদের গোবর্দ্ধনেরও অবস্থা বিবাহের রাত্রে অনেকটা সেই রকম হইল। সে প্রিয়ার বদনমণ্ডলে প্রস্ফুট গোলাপের আভা লক্ষ্য করিল, তাহার কুঞ্চিত কুন্তলদামের সহিত শ্রাবণের নিবিড় জলদজালের তুলনা করিল, তাহার নয়ন দুইটির সহিত কুরঙ্গের অপেক্ষা হস্তীর নয়নের বেশী সাদৃশ্য থাকিলেও, স্ত্রীকে কুরঙ্গনয়না বলিয়াই তাহার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিল। প্রিয়ার প্রতি পদবিক্ষেপে তাহার হৃদ্‌সরোবরে প্রেমপদ্ম ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এক কথায়, গোবর্দ্ধন তখন স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে, নিদ্রিত কি জাগ্রত, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না।

কিন্তু গোলাপেও কাঁটা থাকে; বাসর ঘরে সুচারুবেশে সজ্জিতা স্ত্রীর সঙ্গিনীদিগের সহিত একটী মার্জ্জার শাবকও তাহার নজরে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, এই বিড়ালটিকে তাহার স্ত্রী প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবাসে।

তুচ্ছ ইতর প্রাণী বলিয়াই প্রেমের এই প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে ততটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিল না। কিন্তু পরদিন বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে তাহার শ্বাশুড়ী যখন কাঁদিতে কাঁদিতে কন্যাকে তাহার হাতে সমর্পণ করিয়া দিবার সময় অন্য কথার পর বলিলেন,—"বাবা, আমার এই পাগলা মেয়ের একটা আব্‌দার তোমাকে সহ্য করতে হবে। এই পুসি বেড়ালটিকে ও প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসে; ওকে ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারবে না। পুসিকেও তোমার সঙ্গে নিতে হবে," গোবর্দ্ধন তখন মুখে কোনও প্রকার অসম্মতি জানাইতে না পারিলেও মনে মনে সে তত সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। বাল্যকাল হইতেই কুকুর বিড়ালের প্রতি গোবর্দ্ধনের তেমন মধুর আকর্ষণ ছিল না। বিবাহের পর পত্নীলাভের সহিত যৌতুকস্বরূপ একটা বিড়াল সঙ্গে লইয়া আজীবন তাহার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইবে ভাবিয়া সে একটু বিরক্তও হইল। যাহা হউক, প্রাণটা তখন এক নূতন নেশায় ভরপূর থাকায়, এ তুচ্ছ বিষয় লইয়া বেশী আলোচনা করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। ভাবিল, দুদিন বাদে স্ত্রীকে বুঝাইয়া ও পাপ বিদায় করিলেই হইবে। সে শ্বাশুড়ীর প্রস্তাবে একটুও দ্বিরুক্তি না করিয়া বিড়াল ও স্ত্রী লইয়া নিজগৃহে চলিয়া গেল।

(৯)

গোবর্দ্ধনের পিতামাতা বহুদিন পূর্ব্বেই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইয়াছিলেন। সংসারে তাহার আর তেমন কোনও নিকট আত্মীয় ছিল না। সেও কিছুদিন পরে পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া পশ্চিমে কোনও জমিদারীতে কাজ লইয়া পৈতৃক বাসভূমির মায়া কাটাইয়া চলিয়া যায়। সেখানে সে বেতন পাইত ত্রিশ টাকা; জমিদারির কার্য্যে উপরি দুপয়সাও বেশ ছিল। এক বৎসর চাকুরি করিয়া একটা পেটের খরচ চালাইয়া সে হাতে কিছু টাকাও করিয়াছিল। তখন নিঃসঙ্গ জীবনযাপন আর তাহার ভাল লাগিল না। সে জীবনের সঙ্গিনী অন্বেষণে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। এমন সময় একদিন সুরমার পিতা গোবর্দ্ধনের এক সহকর্ম্মীকে পত্রদ্বারা জানাইলেন যে, কন্যার বিবাহের জন্য তিনি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, পাত্রের সন্ধান পাইলে তাঁহাকে যেন সংবাদ দেওয়া হয়। সুরমার পিতৃবন্ধু অবিলম্বে গোবর্দ্ধনের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন এবং গোবর্দ্ধনের সম্মতিক্রমে সেইদিনই সুরমার পিতাকে পত্র লিখিলেন। পত্রেই কথাবার্ত্তা সব-পাকা হইয়া গেল। তিনি "বরের দরের পীসি ও কনের

ঘরে মাসী" হইয়া বিবাহে বরকর্ত্তা সাজিলেন। তাঁহারই কলিকাতাস্থ বাড়ী হইতে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল।

ফুলশয্যার দিন রাত্রে গোবর্দ্ধন অনেক সাধ্য-সাধনার পর স্ত্রীর ভীষণ লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গাইয়া তাহার দু'একটি কথায় কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছিল, এমন সময় বিছানার পাশ হইতে বিড়ালটা উঠিয়া পত্নীর কোলের নিকট আসিয়া সোহাগ জানাইতে আরম্ভ করিল। দেখিয়াই গোবর্দ্ধনের পিত্ত জ্বলিয়া গেল। তাহার এত চেষ্টা সব ব্যর্থ হইল! ইতর জন্তুর এত বড় স্পর্দ্ধা,—এমন রসভঙ্গ করিয়া স্বামীস্ত্রীর মধুর মিলনে ব্যাঘাত ঘটাইল! সুরমাও বিড়ালকে আদর করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল। গোবর্দ্ধন বিড়ালটার ব্যবহারে হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেও তখন আর কোনও অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল না; কিন্তু মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল, তাহার এত সাধের দাম্পত্য জীবনে সুখভোগের এই কণ্টকটাকে যতশীঘ্র সম্ভব বিদায় করিবেই করিবে।

গোবর্দ্ধনের ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছিল। দু'চারদিন পরেই সুরমাকে পিত্রালয়ে রাখিয়া সে কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া অতীতের স্মৃতির সাহায্যেই বিরহের জ্বালা সহ্য করিয়া সে কোনও প্রকারে দিন কাটাইতে

লাগিল। কিন্তু এ স্মৃতি অন্যান্য বিষয়ে মধুর ও শান্তিদায়ক হইলেও এক বিষয়ে তাহাকে গভীর চিন্তার মধ্যে নিক্ষেপ করিত! সেই বিড়ালটার কথা সে যে কিছুতেই ভুলিতে পারিত না। তাহার শাশুড়ী ও স্ত্রীর সঙ্গিনীগণ সকলেই এক বাক্যে সাক্ষ্য দিয়াছে যে, এটি সুরমার বড়ই প্রিয়পাত্র, সুরমা ইহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে। তাহার প্রেমপত্রের উত্তর আসিতে দেরী হইলে সে ভাবিত, বোধ হয় সেই পাপ বিড়ালটাকে লইয়াই সুরমা ব্যস্ত আছে, তাহাকে পত্র লিখিবার অবকাশ পায় না। এ অভিযোগ একেবারে সত্য না হইলেও ইহার মূলে খানিকটা সত্য নিহিত ছিল। বিড়াল-টিকে সুরমা যথার্থই খুব ভালবাসিত। একবার তাহার পিতার পাত হইতে মাছের মুড়া তুলিয়া লওয়ায়, তাহার স্নেহশীলা জননী রাগে বিড়ালটাকে এক চড় মারিয়াছিলেন, তজ্জন্য সে অভিমান করিয়া সমস্তদিন জলস্পর্শও করে নাই। স্বামীর নিকট প্রত্যেক পত্রে তাহার বিষয় কোন না কোন প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতে ভুলিত না। একখানি পত্রে সে লিখিয়াছিল, "আমি পত্র লিখিয়া খামে মুড়িতেছি, এমন সময় অতর্কিতে বিড়ালটা আসিয়া পত্রখানা দাঁতে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ফেলিল। তজ্জন্য আবার সুযোগমত নূতন পত্র লিখিতে এবার বিলম্ব হইয়া গেল।"

সুরমা বড় আশা করিয়া স্বামীর নিকট তাহার প্রিয়-পাত্রের বাহাদুরি প্রকাশ করিতে যাইত, ভাবিত এসব কথা শুনিলে তাহার ন্যায় তাহার স্বামীও নিশ্চয়ই ইহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে ; কিন্তু হিতে বিপরীত দাঁড়াইল। যতই বিড়ালের গুণের ও বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া স্বামীর নিকট সে পত্র লিখিত, গোবর্দ্ধনের রাগ ততই বৃদ্ধি পাইত। গোবর্দ্ধন মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিত, এ কণ্টককে যে প্রকারেই হউক সরাইতেই হইবে, নচেৎ তাহার বিবাহও বৃথা, এ জীবনও নিষ্ফল।

(：)

বিবাহের এক বৎসর পর সুরমা প্রথম স্বামীর ঘর করিতে পশ্চিমে আসিল। সুরমাকে দেখিয়া গোবর্দ্ধন যত সন্তুষ্ট হইল, তত বিরক্ত হইল তাহার সঙ্গে সেই বিড়ালটাকে দেখিয়া। তাহার বিরক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; কারণ বিড়ালটার জন্য স্ত্রীর সহিত বিরলে বসিয়া দুটো কথা কহিবারও উপায় ছিল না; যখন-তখন বিড়ালটা কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের রসভঙ্গ করিয়া দিত। রাত্রে বিছানায় ঘুমাইয়া আছে, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়াই কি একটা কোমল বস্তুর উপর হাত পড়িলেই গোবর্দ্ধন ভয়ে চমকিয়া উঠিত। সে স্ত্রীকে অনেক করিয়া বুঝাইল, একটা জন্তুর জন্য এতটা ঝঞ্ঝাট পোহান আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে; ওটা উপকারে ত কিছু আসেই না, বরং জিনিষপত্র নষ্ট কর প্রভৃতি নানা অপকার সাধন করে; কিন্তু ফলে বিপরীত হইল। এ কথা শুনা অবধি সুরমা কাঁদিয়া কাঁদিয়া মুখ চোখ ফুলাইয়া ফেলিল। পরে তাহাকে আবার ঠাণ্ডা করিতে গোবর্দ্ধনকে বিস্তর বেগ পাইতে হইল।

একদিন ব্যাপার বড়ই সঙ্গীন্ হইয়া দাঁড়াইল। কি একটা কারণে বিড়াল লইয়া প্রথমে স্বামী স্ত্রীতে প্রবল

বাগবিতণ্ডা হইতে হইতে ক্রমে রীতিমত ঝগড়া হইয়া গেল। বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীতে এই প্রথম ঝগড়া ; তাও একটা তুচ্ছ বিড়াল লইয়া! গোবর্দ্ধনের ক্রোধের আর সীমা রহিল না। তাহার প্রাণাধিকা স্ত্রী কিনা বিড়ালের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহার সহিত কলহ করিল! তবে কি বিড়ালকে সে তাহার অপেক্ষা বেশী ভালবাসে? হিংসাতে তাহার প্রাণ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল।

সে মনে মনে এক মতলব আঁটিল। পরদিন কর্ম্মস্থানে যাইবার সময় সে স্ত্রীর অলক্ষ্যে বিড়ালটাকে এক থলির ভিতর পুরিয়া অনেক দূরে ছাড়িয়া দিয়া আসিল। ভাবিল, আপদ বিদায় হইল। সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, যেন কত বড় একটা বোঝা তাহার ঘাড় হইতে নামিয়া গেল! কিন্তু মধ্যাহ্নে আহারের সময় বাড়ী আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির। সুরমা আহারের কোনও বন্দোবস্ত না করিয়া বিছানায় শুইয়া অনবরত কাঁদিতেছে। গোবর্দ্ধন যেন কিছুই জানে না, এরূপ ভাবে স্ত্রীকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল; ভাবিল, খাটিয়া খুটিয়া বাড়ী আসিয়া গৃহিণীর মুখ ভার দেখা অপেক্ষা যে বিড়ালের শত উপদ্রব সহ্য করাও ভাল ছিল। কিন্তু এখন

আর উপায় নাই। গোবর্দ্ধন উভয় সঙ্কটে পড়িল। সে মুখে দোষ স্বীকার করিতেও পারে না, অথচ স্ত্রীর এই অবস্থা দেখিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।

এদিকে তাহার ক্ষুধার জ্বালায় পেট জ্বলিতেছিল। স্ত্রীকে খোসামুদ করিলে আজ আর পেট ভরিবার কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সে দোকান হইতে কিছু খাবার কিনিয়া আনিয়া নিজে খাইল; কিন্তু বহু অনুনয়বিনয় করিয়াও সুরমাকে জলস্পর্শ করাইতে পারিল না। ব্যাপার এতটা গড়াইবে জানিলে সে এমন কাজ করিত না। আহারান্তে ব্যথিত অন্তঃকরণে সে কর্মস্থানে চলিয়া গেল। সেখানে যাইবার পূর্বে একবার যে স্থানে বিড়ালটাকে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছিল, সেখানটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল কিন্তু কোন ফল হইল না। কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিতে তাহার যেন আর পা সরিতেছিল না। অন্যদিন কখন কাজ শেষ করিয়া বাড়ী যাইবে, তজ্জন্য সে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। আজ বাড়ী গিয়াই প্রিয়ার অশ্রুসিক্ত বদনমণ্ডল ও পদ্মচক্ষুর নীরব ভর্ৎসনার সম্মুখীন হইতে তাহার প্রাণ চাহিতেছিল না। যাহা হউক নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিয়া ব্যাপার দেখিয়াই সে স্তব্ধ হইয়া গেল। দেখিল, সুরমা বিড়ালটাকে কোলে লইয়া

মহানন্দে জলযোগ করিতেছে। এ দৃশ্যে গোবর্দ্ধনের মনে সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হইলেও বাহিরে সে এমন ভাব দেখাইল যেন বিড়ালটা ফিরিয়া আসাতে সে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছে।

সেবার স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্য এই ভাবেই দূরীভূত হইল। গোবর্দ্ধনও অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা ঘটিবেই ভাবিয়া এ বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সে ভাবিত, এমন একটা উপায় যদি নির্দ্ধারিত হয়, যাহাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে ?

(৪)

একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাড়ীর দ্বারদেশে আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। বৃদ্ধার বয়স ষাটের বেশী; তাহার দেহের মাংসপেশী সব কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। চক্ষু কোটরাগত; মুখে একটিও দাঁত নাই। সুরমা বৃদ্ধাকে দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া ভিক্ষা দিতে আসিল। দু'চার কথার পর সুরমা জানিতে পারিল যে, বৃদ্ধার একটি বিশেষ গুণ আছে,—সে লোকের হাত দেখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ গণিয়া দিতে পারে। আর যায় কোথা! সুরমা তাহাকে ধরিয়া বসিল, তাহার হাতটা দেখিয়া দিতে হইবে। বৃদ্ধা তাহাতে স্বীকৃত হইল। "মা, তুমি বড় সুখী হবে, পাকা মাথায় সিঁদুর পরবে," ইত্যাদি দুচার কথা বলিতে বলিতেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। বৃদ্ধা তখন উঠিয়া বলিল, সন্ধ্যার সময় আর হাত দেখিতে নাই। সুরমা ধরিয়া বসিল, কাল দুপুরে আবার আসিয়া বাকি ঘটনাগুলি বলিয়া দিতে হইবে। বৃদ্ধা তাহাতে সম্মত হইয়া পারিশ্রমিক লইয়া বিদায় লইল।

গোবর্দ্ধন সে দিন অপরাহ্ণেই কাজ শেষ করিয়া, সত্য কথা বলিতে গেলে মনিবকে ফাঁকি দিয়া বাড়ী

ফিরিয়াছিল। সে অদূরে বসিয়া এ সব লক্ষ্য করিতে-ছিল। হঠাৎ তাহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে কি এক বুদ্ধি খেলিয়া গেল। সে নীরবে হাসিতে লাগিল।

পরদিন প্রত্যুষে গোবর্দ্ধন অনেক সন্ধান করিয়া গ্রামের প্রান্তে এক জীর্ণ কুটীরে বুড়ীর দেখা পাইল এবং কিছুক্ষণ তাহার সহিত গুজগুজ করিয়া আসিবার সময় তাহার হাতে একটি টাকা দিয়া বলিল,—"কাজ হলে, আরও এক টাকা বক্‌সিস দেব। যা বলে গেলাম, সব যেন গুছিয়ে বলা হয়। আর দুপুর বেলা আমি খেয়ে কাজে বেরুলে, তবে যেও।"

মধ্যাহ্নে আহারাদি শেষ করিয়া সুরমা বৃদ্ধার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। গোবর্দ্ধন যথাসময়ে কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে বৃদ্ধা লাঠিতে ভর দিয়া ঠক্‌ঠক্ করিতে করিতে আসিয়া হাজির হইল। দু'চার কথার পর বৃদ্ধা নিবিষ্টচিত্তে সুরমার হাত দেখিতে বসিল। সেও তাহার উৎসুক নয়ন দুটি বৃদ্ধার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া শুভাশুভ সংবাদ শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। বৃদ্ধা দু'একটা শুভকথা বলিয়া হাতের একটা রেখা দুচারবার ভাল করিয়া দেখিয়া যেন কোনও আশু বিপদের আশঙ্কায় চমকিয়া উঠিল। সুরমারও মুখখানি ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। তাহার বক্ষঃস্থল দুরুদুরু কাঁপিতে লাগিল। বৃদ্ধা বলিল, "মা একটা

ভারি অমঙ্গলের চিহ্ন দেখছি, তোমার স্বামীর একটা বড় ফাঁড়া আছে। কোনও জন্তু,—বেড়াল বা কুকুরে তাঁকে এমন কামড়াবে—যাতে তাঁর প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে ; তবে তোমার এয়োতের জোর আছে,—"

সুরমার তখন বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল। এমন সময় পুসি ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহাকে দেখিয়াই বৃদ্ধা যেন আতঙ্কে চমকিয়া উঠিল, "মা, এ বিড়ালটা কি তোমার ? এটাই দেখছি তোমার সর্ব্বনাশ করবে।"

"তবে কি উপায় হবে ?" বলিয়া সুরমা কাঁদিয়া ফেলিল। বৃদ্ধা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল,—"মা, ভয় কি ? আমি উপায় করে দেব। আমারও একটা ঠিক ঐ রকম বিড়াল ছিল ; তাইতেই আজ আমার এ দশা। তবে শোন, বলি,—

"আজ আমাকে যেমন দেখছো, এমন দশা আমার চিরদিন ছিল না। আমরা জাতে কৈবর্ত্ত। আমার স্বামী ক্ষেতে কাজ করতো। বড় সুখেই আমাদের দিনগুলো কেটে যেতো। ছেলেবেলা থেকেই বাপের বাড়ীতে একটা বিড়ালকে আমি বড় ভালবাসতাম। শ্বশুরবাড়ী আসবার সময় সেটিকে সঙ্গে করে আনি। তার সকল উপদ্রবই

আমি হাসিমুখে সহ্য করতাম বটে; কিন্তু আমার স্বামী ওটাকে বিদায় করবার কথা বলতেন। এই নিয়ে আমা-দের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো। হায়, তখন কে জানত যে, সেই বিড়ালটা আজ আমার এ সর্ব্বনাশের কারণ হবে!—” বলিতে বলিতে তাহার শীর্ণ চক্ষুর্দ্বয় যেন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। সুরমা হতভম্ব হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া একমনে তাহার কথা শুনিতেছিল; বৃদ্ধা আবার বলিতে আরম্ভ করিল —“একদিন সাংসারিক কোনও বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে বচসা হচ্ছিলো, বিড়ালটা কোথায় ছিল লাফিয়ে এসে একেবারে তাঁর গাল কামড়ে ধরলে। এত জোরে ধরলে যে, আমরা দুজনে কিছুতেই প্রথম ছাড়াতে পারলাম না। তাঁর গাল দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগলো। শেষে পাড়ার দুজন লোক এসে লাঠি দিয়ে মেরে বেড়ালটাকে ছাড়ায়; কিন্তু তিনি তখন অজ্ঞান। অনেকটা রক্তপাতে দেহ নির্জীব হয়ে পড়েছিল। ধরাধরি করে হাঁসপাতালে নিয়ে গেলাম। অনেক চেষ্টা হলো, কিন্তু ফল কিছু হলো না। দশদিন জ্বরভোগ করে তিনি মারা গেলেন। হায়, পূর্ব্বে যদি তাঁর কথা মত বিড়ালটাকে তাড়াতাম, তাহলে দুমুটো অন্নের জন্যে আজ আমাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াতে হতো না।”

"তবে আমার উপায় কি হবে? বিড়ালটাকে তুমি নিয়ে যাও। আমি সব খরচ দিচ্ছি, কোনও দূরদেশে ছেড়ে দিয়ে এসো।"

"আচ্ছা মা, তাই হবে। তার আর ভাবনা কি! তুমি ভয় পেও না; তোমার এয়োতের জোর আছে।" বলিয়া সে তখনই বিড়ালটাকে থলের ভিতর পুরিল। সুরমা তাহার চক্ষুর সম্মুখে প্রিয়পাত্রকে এ অবস্থায় বাঁধিতে দেখিল। পূর্ব্বে একদিন তাহার স্বামীও যদি পুসিকে একটু আঘাত করিত, সে সহ্য করিতে পারিত না। আজ সে তাহাকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে তাহার একেবারে কোনও কষ্ট হইল না, তাহা নহে। তাহার মনে হইল যেন হৃদয়ের ভিতর হইতে একটা স্নেহের ডোর কে জোর করিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া দিল। কিন্তু কোন উপায় নাই!

সে বৃদ্ধাকে অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিল। পরে সাংসারিক কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। স্বামীর জন্য তাহার প্রাণ বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। গোবর্দ্ধন কার্য্য কতদূর সফল হইয়াছে, ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিল। তাহাকে দেখিবামাত্র সুরমা হাসিমুখে তাহার নিকটে আসিয়া বলিল,—"আজ একটা সুখবর আছে। তোমার আপদ বিদায় হয়েছে।"

"ব্যাপার কি ?"

সুরমা স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া বৃদ্ধার কথা যথাযথ বর্ণনা করিল ; মধ্যে মধ্যে অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় সে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। গোবর্দ্ধনের স্ফূর্ত্তি আর ধরে না! সে বাহিরে কতই যেন কাতরতা দেখাইয়া স্ত্রীকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলিল,—"একটা গণৎকারের কথা শুনে তুমি বিড়ালটাকে বিদায় করে দিলে! ওরা যদি সব সত্যি কথা বলতে পারতো, তাহলে আর ভাবনা ছিল কি! দেখ, আমারও আজকাল সেটার ওপর কেমন একটা মায়া পড়েছিলো।" এ উক্তির সত্যাসত্যতা বিচার করিবার মতন ক্ষমতা তখন আর সুরমার ছিল না।

সোনার কণ্ঠী।

(১)

যুবতী সুন্দরী—অসামান্যা সুন্দরী! সে তীব্র সৌন্দর্য্য-সুধাপানে পুরুষের চিত্তচকোর উন্মত্ত হইয়া উঠে। বর্ষা-সমাগমে নবপল্লবিত বৃক্ষের ন্যায় যৌবনের ভারে তাহার সমস্ত শরীর নূতন মাধুর্য্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সে মাধুর্য্য অলৌকিক হইলেও, দিব্য আভামণ্ডিত বলিয়া মনে হয় না। শয়তান আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য যে সব স্ত্রীলোককে পৃথিবীতে প্রেরণ করে, তাহাদের এমনই সুন্দরী করিয়া পাঠায়!

যুবক তাহাকে তাহার সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। সে ভালবাসার সীমা ছিল না; সে ভালবাসা আপন সিদ্ধির পথে কণ্টকস্বরূপ কোনও পার্থিব বাধাবিঘ্ন গ্রাহ্য করিত না। সে ভালবাসা সুখের অন্বেষণে বৃথা কঠোর পরিশ্রম করিয়া শেষে ব্যর্থমনোরথ হইয়া সুখভ্রমে দুঃখকেই বরণ করিয়া লয়। বোধ হয়, গত জন্মজন্মান্তরের কোনও ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহার কোমল সরস প্রাণে এরূপ প্রেম-মরীচিকার সৃষ্টি হইয়াছিল!

যুবতী অপরাপর বিষয়ে তাহার দলের অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় সমভাবাপন্না না হইলেও, তাহাদের ন্যায় সেও বড় বিলাসিনী ও অব্যবস্থিতচিত্ত। তাহার মানস-সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার ন্যায় মুহূর্ত্তে শত শত বাসনা উদিত ও লীন হইতেছে। যুবক বুদ্ধিমান ও সাহসী; কিন্তু মায়াবিনীর মায়াজালে জড়িত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যায়; সে জাল ছিন্ন করিবার মত সামর্থ্য তখন তাহার থাকে না। প্রণয়িনীর চিত্রাঙ্কিতবৎ আকর্ণ-বিস্তৃত নীলাভ পদ্মনেত্র দু'টির দিকে চাহিলে, তাহার সহজবুদ্ধি সম্পূর্ণ লোপ পায়; যুবক একেবারে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে।

(৯)

যুবতীকে একদিন কাঁদিতে দেখিয়া যুবক কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"একি, কাঁদ্‌ছো কেন ?"

যুবতী চোখের জল মুছিয়া একদৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। মুহূর্ত্তপরেই আবার সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। যুবক মুগ্ধ নেত্রে তাহার সম্মুখীন হইয়া সাদরে তাহার হাত ধরিতেই সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ঘরের উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া স্রোতস্বিনীর খরপ্রবাহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যুবক স্নেহার্দ্রকণ্ঠে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন কাঁদ্‌ছো, বল না ?"

ক্ষুদ্র বাড়ীখানির পাদদেশ ধৌত করিয়া নদী ফুলিয়া ফুলিয়া বহিয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউগুলি নদীবক্ষে উত্থিত হইয়া ক্রমে তীরের উপর সশব্দে আছড়াইয়া পড়িতেছে। সূর্য্যদেব স্বর্ণরশ্মি-মণ্ডিত নারিকেল বৃক্ষের শিখর দেশের পশ্চাতে ডুবিয়া গিয়াছে। গোধূলির ধূসর অন্ধকার-রাশি নদীগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া কোমল সূক্ষ্ম আবরণ-বস্ত্রের ন্যায় মৃদুসমীরণভরে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ ; কেবল নদীপ্রবাহের কল্‌কল্‌, ছল্‌ছল

শব্দ সে গম্ভীর নীরবতার বক্ষে মধ্যে মধ্যে আঘাত করিতেছে।

যুবকের দিকে মুখ ফিরাইয়া যুবতী বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে উত্তর করিল, "কেন কাঁদছি, ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। আমি নিজেই জানি না কেন কাঁদছি, তোমাকে উত্তর দিব কি করে! আর জবাব দিলেও তুমি তা বুঝতে পারবে না। স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণে ফল্গুনদীর মত অনেক গুপ্ত আকাঙ্খার স্রোত মানব-চক্ষুর অন্তরালে বয়ে যায়; তার মর্ম্মস্থল হ'তে যে গভীর দীর্ঘশ্বাস মধ্যে মধ্যে বাতাসে কম্পিত হয়ে ওঠে, তাতে তার কণামাত্রও প্রকাশ পায় না। আমাদের কল্পনানেত্রের সম্মুখে কত সোণালী রংয়ের সুখস্বপ্নের ছবি ভাসতে থাকে, ভাষায় তা প্রকাশ করা অসম্ভব। অনন্ত রহস্যময় নারী-চরিত্রের অবোধগম্য অসামান্য বৃত্তিসমূহের রহস্য-উদ্ঘাটন করবার উপযুক্ত ক্ষমতা ভগবান পুরুষমানুষকে দেন নাই। তোমার পায়ে ধরি, এ দারুণ মর্ম্মব্যথার কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। সে কথা তুমি শুনলে নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দেবে আমারও লজ্জার সীমা থাকবে না।"

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি শেষ করিয়া যুবতী মাথা নীচু করিয়া রহিল। যুবক বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে পুনর্ব্বার

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ব্যাপারটা কি খুলেই বল না। আমাকে কি তুমি এতই নীচ অপদার্থ ভাব যে, তোমার এত বড় একটা দুঃখের কারণকে আমি হেসে উড়িয়ে দেব! এ পর্য্যন্ত আমার কোনও কাজে কি আমার বিষয়ে এ রকম কোনও ধারণা তোমার মনে আমি জন্মিয়ে দিয়েছি?"

যুবতী কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিল। শেষে ফুঁপাইয়া ফুপাইয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল,—"তবে কি সে কথা শুনতে তোমার এতই ইচ্ছা? কিন্তু শুনে আমাকে উপহাস করতে পারবে না। এ গভীর মর্ম্মবেদনা বরং সহ্য করতে পারি, তোমার উপহাস কিন্তু তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় আমার অন্তরে গিয়ে বিঁধবে। তবে শোন—

"কাল সন্ধ্যায় মঙ্গলচণ্ডী দেবীর আরতি দেখতে গেছলাম। মায়ের মন্দির লোকে লোকারণ্য। মন্দিরের মধ্যস্থিত দেবীপ্রতিমা জ্বলন্ত অঙ্গারের মত দেখ্‌তে হয়েছিল। কাঁশর ঘণ্টার শব্দে স্থানটি মুখরিত হয়ে উঠেছিল। পুরোহিত মশায় বিশেষ মনোযোগের সহিত সান্ধ্য-আরতি সম্পন্ন করছিলেন। সে স্থানে তখন যেন একটা ভক্তির স্রোত বয়ে যাচ্ছিলো।

"আমিও চোখ বুজে এক মনে দেবীর আরাধনা করতে

লাগলাম। একবার হঠাৎ চোখ চাইতেই দেবীমূর্ত্তির কণ্ঠ-দেশস্থ একটি দ্রব্যের উপর আমার নজর পড়ল। সেদিক হ'তে দৃষ্টি আর ফিরাতে পারলাম না। পূর্ব্বে সেটি আর কখনও দেখি নাই,—তার কি যে মোহিনী শক্তি তা বলতে পারি না, আমার সমস্ত মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করে নিল! ভয়ে শিউরে উঠো না—জিনিষটা হচ্ছে মায়ের গলার সোণার কণ্ঠী। আমি জোর করে অন্য দিকে চোখ ফিরালাম। পুনর্ব্বার চোখ বুজে মায়ের আরাধনা করবার চেষ্টা করলাম; কিন্তু অসম্ভব! আমার সকল চেষ্টাই বিফল হ'ল! পোড়া চোখ দু'টা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুরে ফিরে কেবল সেইদিকেই ফিরে যেতে লাগলো। মন্দিরের ভিতর-কার ঝাড়ের আলো সেই কণ্ঠীর ওপর প্রতিফলিত হওয়ায়, উজ্জ্বল পাথরগুলো যেন আরও জ্বল্‌জ্বল্ করছিল। নানাবর্ণের অসংখ্য উজ্জ্বল চঞ্চল আলোকরশ্মি—লাল, নীল, সবুজ, পীত—জ্বলন্ত অগ্নিকণার ঘূর্ণির ন্যায়, অগ্নিময় প্রেতাত্মার বিহ্বল নৃত্যের ন্যায়, সেই মহামূল্য রত্ননিচয়ের চতুর্দ্দিকে নাচ্‌তে লাগলো!

"আমি মন্দির ত্যাগ করে বাড়ী ফিরলাম, কিন্তু সে চিন্তা মন হ'তে কিছুতেই দূর করতে পারলাম না। মুখে কিছু আহার আর রুচলো না; জোর করে বিছানায়

শুয়ে পড়লাম ; কিন্তু পোড়া চোখে কিছুতেই ঘুম আর এল না। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে গেল ; অথচ সে চিন্তার ভার ভূতের ন্যায় আমার ঘাড়ে চেপে রইলো ! ভোরের বেলা একটু তন্দ্রা এল, তারপর—শুনলে কি তুমি বিশ্বাস করবে ? তন্দ্রার ঘোরে দেখলাম, এক সুন্দরী স্ত্রীলোক গলায় সেই কণ্ঠী ঝুলিয়ে আমার সম্মুখে হাজির হলো। সে কিন্তু দেবীমূর্ত্তি নহে—আমাদেরই ন্যায় রক্তমাংসে গঠিত এক নারীমূর্ত্তি। সে আমার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপসহকারে হাসতে লাগলো ; খানিকক্ষণ পরে তার কণ্ঠহারের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে আমাকে বল্লে,—'দেখতে পাচ্ছো কেমন ঝক্ঝক্ করে জ্বলছে,—যেন নিদাঘের নিশীথে আকাশ হ'তে তারাগুলি সব চুরি করে কে এ মালা গেঁথেছে,—দেখতে পাচ্ছো ? এ হার গলায় পরা তোমার ভাগ্যে নেই, কখন হবেও না। এমন উজ্জ্বল রত্নখচিত, এমন সুন্দর—' হঠাৎ আমার তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। কিন্তু সে স্বপ্ন তখনও আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগলো। তারই স্মৃতি জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় আজ দিনরাত আমাকে দগ্ধ করছে। শয়তানের একি পৈশাচিক লীলা ! একি, তুমি মাথা নীচু করে চুপ করে রইলে কেন ? আমায় পাগল ঠাওরাচ্ছ, নয় ?"

যুবকের মনের মধ্যে চিন্তার যে ভীষণ ঝড় বহিতেছিল,

তাহারই আঘাতে বাহিরে তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। যুবতীর শেষ কথায় সে অবনত মস্তক উন্নত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—"হায়, অপর কোন রমণীর গলায় সে অলঙ্কার শোভা পায় নি কেন? রাজার ভাণ্ডারে সে রত্ন থাকলেও ভাবনা ছিল না। রাণী যদি নিজের গলায় সে হার পরে থাকতেন, তাহ'লেও যে ভাল হতো! শয়তান স্বহস্তে ধরে রাখলেও, নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও তোমার জন্য সে হার আমি ছিনিয়ে কেড়ে আনতে পারতাম! কিন্তু, হায় মা মঙ্গলচণ্ডীর গলা হ'তে—আমাদের গ্রামের আরাধ্যা দেবীর গলা হ'তে—আমি, আমার জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর—না, না,—সে অসম্ভব, অসম্ভব!"

যুবতী অস্ফুটস্বরে গুঞ্জন করিল,—"অসম্ভব বলেই ত প্রথম তোমায় বল্‌তে চাই নি!" সে আবার মুখে হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

যুবক হতবুদ্ধি হইয়া একদৃষ্টিতে নদীর ঊর্মিমালার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার উদাস দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া তরঙ্গগুলি ধীরে ধীরে অট্টালিকার পাদদেশে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গাঢ় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। নিশাদেবী তারকাখচিত নীলাম্বর পরিধান

করিয়া প্রেমাস্পদের মিলন-আশায় অভিসারে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন।

(৩)

গ্রামের মধ্যভাগে মঙ্গলচণ্ডী দেবীর প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির। গভীর নিশীথের ঘন অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া মন্দিরের নিকট এক মনুষ্যমূর্ত্তির ছায়া দৃষ্ট হইল। এ কি! এ যে আমাদেরই সেই পরিচিত যুবক! যে বিষয়ের চিন্তা মাত্রেই তাহার দেহ আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিবার এত সাহস তাহার কোথা হইতে আসিল? প্রণয়িনীর জ্বালাময় উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে কি এতটা মনের জোর হওয়া সম্ভব? তাহার পদ্মকোরকবৎ নেত্রের দুই বিন্দু মুক্তাফলের কি এতই অসীম ক্ষমতা? তাহাও কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু সেই যুবকই ত দাঁড়াইয়া—তাহার ভীষণ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত! তাহার চঞ্চল দৃষ্টিপাতে, গভীর দীর্ঘশ্বাসে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঘন কম্পনে, কপোলদেশে সঞ্চিত বড় বড় স্বেদবিন্দুজালে, প্রাণের অব্যক্ত ভাষা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে!

যুবক একবার চারিদিকে তাকাইল। নিকটে জনমানবের কোনও চিহ্ন নাই। মন্দিরটি এখন সর্ব্বজন-পরিত্যক্ত। এক একদিন কোনও অভাগা বা অভাগিনী আত্মীয়স্বজনের হিতাকাঙ্খায় দেবীর মন্দিরে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু আজ আর সেখানে কেহই নাই,—শয়তান আজ তাহার সহায় হইয়া এমন অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিয়াছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ; কেবল মধ্যে মধ্যে শৃগাল কুক্কুরের চীৎকারধ্বনি সে গম্ভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে!

যুবক অনেকটা নির্ভয় অন্তঃকরণে অগ্রসর হইয়া মন্দিরের উপর উঠিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। নির্জ্জন অন্ধকারময় স্থানেও মনুষ্য-কণ্ঠস্বরের ন্যায় অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা বোধ হয় বাতাসের মৃদুমন্দ শব্দ, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরধ্বনি, অথবা প্রকৃতিদেবীর অশরিরী আত্মার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর! যুবকের মনে হইতে লাগিল, যেন তাহার সম্মুখে, পশ্চাতে, আশে পাশে, মনুষ্যকণ্ঠের চাপা মৃদু স্বর ও মনুষ্য গমনাগমনের ধীর পদশব্দ শ্রুত হইতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই কোন অজানা বিপদের আশঙ্কায় সে চমকিয়া উঠিতে লাগিল।

মন্দিরের দ্বারে তিনটি শক্ত চাবির তালা লাগান ছিল। যুবক তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিল। সে হস্তস্থিত

লৌহশলাকার দ্বারা তালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিল। পূজারি সন্ধ্যা-আরতি শেষ করিয়া মন্দিরের ভিতর একটি দীপ জ্বালিয়া রাখিয়া গিয়াছিল! সেইটি মিটমিটি জ্বলিতেছিল। এই গ্রামের বাজারে পঞ্চানন্দের বিগ্রহ আছে। গ্রামবাসীর বিশ্বাস, পঞ্চানন্দ দেব রাত্রে বিশ্রামার্থ দেবীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তজ্জন্য রাত্রে মন্দিরের ভিতর একটি আলো জ্বালান থাকে। সেই ক্ষীণ আলোকে সে দেখিতে পাইল, দেবীর গলায় সোনার কণ্ঠী জ্বলজ্বল করিতেছে! আর তাহাকে পায় কে? এবার এ অমূল্য ধন নিশ্চয়ই তাহার হস্তগত হইবে। প্রেমাস্পদের বদনকমলে আর বিষাদের রেখা তাহাকে দেখিতে হইবে না। এই অলঙ্কার লইয়া গিয়া সে স্বহস্তে তাহার গলদেশে পরাইয়া দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিবে, এবং যাহার জন্য গভীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে তাহার বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধে এই অসমসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, সেই প্রণয়িনীর অধরপ্রান্তে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা দেখিয়া সমস্ত শ্রম সার্থক জ্ঞান করিবে। তাহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে পৃথিবীর অন্যান্য সকল মূর্ত্তি, সকল দ্রব্য একে একে অন্তর্হিত হইতে লাগিল, কেবল যুবতীর প্রেমনীরভারাক্রান্ত চিত্রাঙ্কিতবৎ নেত্রদু'টি তাহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতে লাগিল।

যুবক সাহসে ভর করিয়া দেবীমূর্ত্তির নিকট অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল। কিন্তু, এ কি, তাহার পা যে নড়ে না! তাহার মনে হইল, যেন পাষাণের মেজের সহিত তাহার পা সংলগ্ন হইয়া গিয়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে। সে অবনত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। আতঙ্কে তাহার সমস্ত দেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল,যেন একটা বরফের মত ঠাণ্ডা অস্থিচর্ম্মসার হস্ত তাহাকে অমানুষিক শক্তিতে চাপিয়া ধরিয়াছে। উন্মুক্ত দরজা দিয়া সে একবার বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল। আকাশের তারাগুলি নিবিড় মেঘজালের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া এক বিরাট অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতি গম্ভীরমূর্ত্তি—যেন আসন্ন প্রলয়ের পূর্ব্বলক্ষণ! তাহার ধারণা হইল যেন দেবীপ্রতিমা ও মন্দিরের ভিতরকার অন্যান্য সকল দ্রব্যই নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে, আর শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত প্রাণহীন মন্দিরটাও সঙ্গে সঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে!

যুবক জোর করিয়া পা চালাইতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিক অন্ধকার! নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ক্ষীণ আলোক-রশ্মি অন্ধকারের অপেক্ষা আরও ভয়প্রদ! বোধ হইল যেন অসংখ্য ভীষণকায় নরমূর্ত্তিপূর্ণ কোনও দুঃস্বপ্ন-রাজ্যে সে বিচরণ করিতেছে। সে প্রতিমার সম্মুখীন

হইয়া দেবীর মুখের দিকে তাকাইল। এ কি, এই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যেও দেবীর প্রশান্ত বদনে যে গম্ভীর মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া রহিয়াছে! সে নির্ব্বাক হাসি ক্ষণেকের জন্য তাহার চিন্তালোড়িত মস্তিষ্কে শান্তি আনয়ন করিয়া পরক্ষণেই আবার বিস্ময়ে ও ভয়ে তাহাকে আপ্লুত করিয়া দিল। এরূপ অদ্ভুত সর্ব্বগ্রাসী ভয় সে জীবনে আর কখনও অনুভব করে নাই!

সে প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিল। দেবীপ্রতিমার উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া তাহার কম্পিত দক্ষিণ হস্তখানি দেবীর দিকে প্রসারিত করিয়া দিল এবং পর-মুহূর্ত্তেই সেই মহামূল্যবান অলঙ্কার দেবীর কণ্ঠদেশ হইতে ছিনাইয়া লইল!

আর কি, ঈপ্সিত ধন ত তাহার হাতের ভিতর! তাহার কম্পিত অঙ্গুলগুলি অস্বাভাবিক জোরে সেটিকে ধরিয়া রহিল। এবার তাহাকে এ স্থান হইতে পলাইতে হইবে—কিন্তু চোখ তুলিয়া পথ দেখিয়া লইতে তাহার সাহস হইল না। দেবীপ্রতিমা বা মন্দিরাভ্যন্তরস্থ অন্যান্য দেবদেবীর ক্ষুদ্র মূর্ত্তির দিকে সে তাকাইতে পারিল না। তাহার মনে হইল এই সব যেন রহস্যময় ভীতিপ্রদ

ভীমকায় মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া মন্দিরের এক কোণে আসিয়া সমবেত হইতেছে।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস আসিয়া মন্দিরের আলোটা নিভাইয়া দিল। তখন চোখ খুলিয়া সে একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। অমনই মন্দিরকক্ষ বিকম্পিত করিয়া এক তীব্র আর্ত্তনাদ তাহার ওষ্ঠদ্বয় হইতে উত্থিত হইল। একি, স্থানটি যে তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর জীবন্ত মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ! তবে কি তাঁহারা তাঁহাদের স্বতন্ত্র বাসস্থান ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব সুচারু বেশে সজ্জিত হইয়া মন্দিরতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন? তাঁহারা আবার রোষকষায়িত নেত্রে তাহার মুখের দিকে তাকাইতেছেন কেন?

দেখিতে দেখিতে তাঁহারা কোথায় সব অদৃশ্য হইয়া গেলেন; পরক্ষণেই যুবকের মৃত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীর প্রেতাত্মা, ভীষণাকৃতি দৈত্য ও দানবের মূর্ত্তি, রক্তলোলুপ হিংস্র জন্তুগণের সূক্ষ্ম দেহ তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে তাহার চক্ষুর সম্মুখ দিয়া একে একে চলিয়া গেল।

সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার দেহের শিরাউপশিরাসমূহ ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। এক

ঝলক রক্ত তাহার মুখ হইতে নির্গত হইল। সে দ্বিতীয়বার চীৎকার করিয়া মেজের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল!

*   *   *   *

পরদিন প্রভাতে পূজারি মন্দিরে আসিয়া দেখিল, যুবক মেজের উপর পড়িয়া আছে। তাহার চোয়ালে খানিকটা রক্ত বরফের ন্যায় জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। সোনার কণ্ঠী তখনও তাহার মুঠার ভিতর রহিয়াছে। পূজারিকে নিকটে অগ্রসর হইতে দেখিয়া যুবক ভয়ঙ্কর অট্টহাস্য করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল;

"এ তা'র জন্য! তা'র জন্য! সে বড়ই কেঁদেছিল!"

যুবকের উন্মত্ত দৃষ্টি দেখিয়া ও প্রলাপ বাক্য শুনিয়া সবাই স্থির করিল যে, সে পাগল হইয়া গিয়াছে!

অন্ধ।

"তোমার কি এতদূর সাহস হবে? তা' ত বিশ্বাস হয় না!"

রহমন হস্তস্থিত একটী আলোকচিত্রের দিকে তাকাইয়া এই কথাগুলি বলিল। তাহার ওষ্ঠাধরে বিদ্রূপব্যঞ্জক হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়িয়া ছবিখানি সে যথাস্থানে রাখিয়া দিল। ছবিখানি এক অসামান্যসুন্দরী স্ত্রীলোকের। তাহার উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় যেন হাসিতেছে! প্রথম দৃষ্টিতে ছবিখানিকে জীবন্ত স্ত্রী-মূর্ত্তি বলিয়াই ভ্রম হয়। এরূপ অলৌকিক সৌন্দর্য্য, অসীম রূপরাশি পুরুষমানুষকে অনায়াসেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিতে পারে।

রহমন মনে মনে কি এক মতলব আঁটিল। ছবির দিকে তাকাইয়া বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, "আমার নিজের ওপরও বিশ্বাস হচ্ছে না। ভয় হচ্ছে, পাছে দু'দিন বাদে এ মোহের ঘোর কেটে যায়; আর আমরাও পরস্পরের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠি। আমাদের এ অনুরাগ যে আজীবন স্থায়ী হবে, তা' জোর করে বলা বড় শক্ত।"

. .

সে অধীরভাবে ঘড়ির দিকে তাকাইল, নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণপ্রায়। তখন বারান্দায় আসিয়া সে পায়চারি করিতে লাগিল। এমন সময় একখানি গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল। আপাদমস্তক আবৃতা এক স্ত্রীলোক একাকিনী গাড়ী হইতে নামিল। রহমন আর কালবিলম্ব না করিয়া নীচে নামিয়া গেল এবং স্ত্রীলোকটির হাত ধরিয়া তাহাকে একেবারে উপরের ঘরে আনিয়া উপস্থিত করিল।

স্ত্রীলোকটি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "সব ঠিক?"

"নিশ্চয়ই, সব প্রস্তুত। অত সন্তর্পণে কথা কইবার কোনও প্রয়োজন নেই। এ বাড়ীতে এখন কেউ নেই। চাকর ও বাবুর্চ্চি দু'জনকেই স্থানান্তরে পাঠিয়েছি।"

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকটা আরাম-কেদারার উপর বসিয়া পড়িল। রহমন প্রেমপূর্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে একবার তাকাইয়া তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল। স্ত্রীলোকটি রহমনের অঙ্গুলীর মধ্যে নিজের অঙ্গুলিগুলি সন্নিবেশিত করিয়া কেদারার বড় হাতার উপর তাহাকে টানিয়া বসাইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া স্ত্রীলোকটি মেজের দিকে তাকাইয়া বলিল,—"রহমন! আমার বড় ভয় পাচ্ছে!" রহমনের মুখের দিকে তাকাইতে তাহার সাহস হইল না।

"এ আর আশ্চর্য্য কথা কি? এ অবস্থায় সকল স্ত্রীলোকেরই মনে ভয়ের সঞ্চার হয়; কিন্তু ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। আজীবন আমি তোমাকে প্রাণভরে ভালবাসব। প্রাণান্ত পরিশ্রম করেও তোমাকে সুখে রাখবার চেষ্টা করব। তুমি কি অতীতের সে সব কথা ভুলে গেলে, পিয়ারা! বাল্যকালেই আমাদের আলাপ-পরিচয় হয়। সে আলাপ ক্রমেই ঘনিষ্ঠ সদ্ভাবে পরিণত হ'ল। তখন মনে করেছিলাম, একদিন তোমাকে জীবনসঙ্গিনী করে সুখসাগরে ভাস্‌বে। কিন্তু আল্লা সে সাধে বাদ সাধলেন। কোথা হতে বন্ধু জাহির এসে আমাদের মধ্যে দাঁড়াল। তোমার পিতা তাঁকেই আমার অপেক্ষা যোগ্যপাত্র বিবেচনা করে তার হাতেই তোমাকে সমর্পণ করলেন। সেদিন প্রাণের মধ্যে যে অব্যক্ত যন্ত্রণারাশি পুঞ্জীভূত হয়েছিল, এ যাবৎ তার দাহনে ভস্মীভূতপ্রায় হয়েছি। এত কষ্টের মধ্যেও এক সান্ত্বনা ছিল যে, মধ্যে মধ্যে বন্ধুর বাড়ী তোমার সাক্ষাৎ পেতাম; আমি অপর কোনও স্ত্রীলোককে ভালবাসি নি, কাউকে বিবাহও করি নি। ভগবানের কৃপায় আজ যখন আবার সুদিন এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন আর উপেক্ষা করা উচিত নয়। তাঁরই অসীম করুণারাশি বক্ষে ধরে, এস

আজ আবার আমরা সংসারপথে অগ্রসর হই। তুমিও আমাকে নিশ্চয়ই ভালবাস!"

রমণী মুখে ইহার কোনও উত্তর দিল না। কেবল মাথা নত করিয়া প্রণয়াস্পদের হস্ত চুম্বন করিল। পরে আর্দ্রনয়নে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—"হাঁ, আমার বিশ্বাস, তুমি আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করবে। দাম্পত্যজীবনে সুখের আস্বাদ কণামাত্রও ভোগ করি নাই। স্বামীর ভালবাসা লাভ করবার জন্য আমি বড়ই লালায়িত হয়েছিলাম, কিন্তু তা'র পরিবর্ত্তে আমার ভাগ্যে কেবল অবহেলা ও উপেক্ষা লাভ হয়েছে। যাক্, ওসব বিষয়ের উল্লেখ করে এখন আর কোন লাভ নেই।"

"ও সব কথা আলোচনায় আর ফল কি! বিগত জীবনের পৃষ্ঠায় যা' কিছু অঙ্কিত হয়েছে, সে সব মুছে ফেল। অতীতকে বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়ে দাও। আমরা এ অঞ্চল ত্যাগ করে কোন এক দূরদেশে গিয়ে বাস ক'রব। এখানে থাক্‌লে, অনেকে আমাদের বিদ্রূপ করতে পারে, জাহির ফিরে এসে আমাদের সুখের পথে আবার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু সেখানে কেউ আমাদের চিনবে না, আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে পারব। জাহির নির্ব্বোধ, তাই এমন রত্ন চিনতে পারলে না! তুমি এখানে

একটু বিশ্রাম কর ; ব্যস্ত হ'বার প্রয়োজন নেই। এখনও এক ঘণ্টা সময় আছে।"

"এ সব বিষয় ভাবতে ভাবতে অনেক পুরাতন কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমি সব ভুলে তোমারই চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলাম। দেখো, দু'দিন বাদে যেন বিরক্ত হয়ে আমাকে চরণে ঠেলো না।"

"আজকের দিনে আর ওসব অমঙ্গলের কথা তুলছো কেন ? মনে কর, আজ যেন তুমি নূতন ভাবে দাম্পত্য জীবন আরম্ভ করছো।" তোমার পূর্ব্বেকার অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত একেবারে ভুলে যাও।"

রমণী মাথা নাড়িয়া বলিল,—"সে সব ভুলতে এখনও অনেক দিন লাগবে। রহমন! একবার ভাব দেখি কি মহামূল্য রত্ন পশ্চাতে ফেলে যাচ্ছি। তোমার প্রেম লাভের জন্যে কি ভয়ানক ত্যাগস্বীকারই আমাকে করতে হচ্ছে। সে কথা ভাবতেও আমার সমস্ত দেহ কেঁপে ওঠে!"

"ওঃ, শিশুকন্যার কথা বলছ!"

রমণী তাহাকে অঙ্গুলিসঞ্চালনের দ্বারা থামিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "ও কথা আর তুলো না। তুমি জান, আরও অনেক দিন পূর্ব্বে এ প্রস্তাব একবার আমার কাছে করেছিলে ; তখন আসতে পারতাম, কিন্তু ওর জন্যই পারিনি।

আজ আর মনকে দমন করতে না পেরে চলে এসেছি। সে তখন ঘুমাচ্ছিল! জীবনে বোধ হয় আর সে চাঁদ মুখ দেখতে পাব না! রহমন, এ কষ্ট ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেউই অনুভব করতে পারে না! বাছার ঘুমন্ত মুখে অশ্রুসিক্ত বিদায়ের শেষ চুম্বন অঙ্কিত করে দিয়ে এসেছি। চুম্বনে শিশু শিউরে উঠল; একবার মনে হল, বুঝি বা জেগে ওঠে; তা'হলে আর আসা হত না। জাহিরের আত্মীয়েরা তাকে সযত্নে লালনপালন করবে বলেই মনে হয়। সেও খুব শান্ত, সুবোধ। একবার তা'কে দেখলে, কেউ ভাল না বেসে থাকতে পারবে না। না, না, ওকথা ছেড়ে দাও। এস, আমরা অন্য বিষয়ে কথা কই।" রমণী বহু-কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিল। ঘরের ভিতর তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, এই বাড়ীতেই পূর্ব্বে জাহির থাকত না?"

"হাঁ, তোমাকে বিবাহ করবার পূর্ব্বে, সে এ বাড়ীতেই থাকত। এ বাড়ী তা'রই ছিল, পরে আমাকে বিক্রয় করে।"

"কি মজার কথা! আজ আবার এতকাল পরে আমরা সেই বাড়ীতেই বসে, তা'র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছি।"

"তুমি যে আসল কথা ভুলে যাচ্ছ। তোমার এতে দোষ কি বল? জাহিরই ত তোমাকে একাকিনী নিঃসহায়

অবস্থায় ফেলে চলে গেল! তার পর পাঁচ ছয় মাস হয়ে গেল, তার আর দেখা নেই। স্বামীর এ উপেক্ষা ও অবহেলা স্ত্রীর পক্ষে অসহ্য!"

রমণী তাহার মুখের দিকে না তাকাইয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"এ কথা সত্য। কিন্তু হঠাৎ তার এরূপ পরিবর্ত্তন কেন হলো তা বুঝতে পারলাম না। বিবাহের পূর্ব্বে ও কিছু পরেও তার স্বভাবচরিত্র এমন খারাপ হয়নি। কোথায় আছে, তারও সংবাদ দেয় না। মধ্যে দু' একখানা পত্র লিখেছিলো, তাও পাগলের প্রলাপ মাত্র, অর্থ করা দুরূহ; আবার চিঠিতে তার ঠিকানাও দেয় নি।"

"এ রহস্যের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও স্ত্রীলোক আছে। তা'র প্রতি অনুরক্ত হয়ে, তোমাকে সে একেবারে ত্যাগ করে চলে গেছে। যাক্, আজ থেকে তুমি আমার হ'লে; আর জাহিরের সম্বন্ধে কোনও আলোচনার প্রয়োজন নেই।"

রমণী তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া কহিল,—"প্রথম হ'তেই অত্যাচার আরম্ভ করো না। সে সব কথার আলোচনা এত শীঘ্র ত্যাগ করতে পারা কি সম্ভব? সে সব বিষয় ভাবতে ভাবতে কত বিনিদ্র রজনী কেঁদে কাটিয়েছি; আজও সে কথা মনে পড়ায়, চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছে; কিন্তু

আজ আর আমার সে দিকটা তোমাকে দেখাতে ইচ্ছা করি না। আজ হ'তে আবার নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করাই সঙ্গত। জাহির বলে যে কোনও লোক পৃথিবীতে ছিল, তা ভুলে যাবার চেষ্টা করবো। তবে কিছু দিন সময়—ও কি, বাইরের দরজার কড়া নাড়ে কে ?"

তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। এমন সময় আবার ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। রহমন ভ্রুকুটি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যাইবার সময় স্ত্রীলোকটিকে চুপি চুপি বলিয়া গেল,—"পিয়ারা, তুমি না হয় পাশের ঘরে একটু অপেক্ষা কর গে। কি জানি, এমন সময় কে আবার জ্বালাতে এল! যেই আসুক, আমি পাঁচ মিনিটে তা'কে বিদায় করবার চেষ্টা করবো। তোমাকে বেশীক্ষণ একলা বসে থাকতে হবে না।"

স্ত্রীলোকটি ত্রস্তভাবে পাশের ঘরে প্রবেশ করিলে, রহমন ঘরের দরজা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিল। পরে নীচে নামিয়া বাহিরের দরজা খুলিতেই সম্মুখে এক দীর্ঘকায় মূর্ত্তি দণ্ডায়মান দেখিল। তাহাকে দেখিয়াই সে প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেবল অস্ফুট-স্বরে দু'টি কথা তাহার ওষ্ঠদ্বয় হইতে নির্গত হইল,—"কি হে ?"

"কি, রহমন, তুমি? আমি মনে করেছিলাম, তোমার লোক জন কেউ হবে। চল, ওপরে যাই। আর কেউ আছে না কি?"

রহমনের মাথা ঘুরিতেছিল। কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া যা মুখে আসিল বলিয়া ফেলিল।

"না, আমি একলা। জাহির, এতকাল পরে তুমি যে হঠাৎ আজ এখানে আসবে, এ একেবারে আশাতীত! এস, ভিতরে এস।"

লোকটি অতি সন্তর্পণে দেওয়াল ধরিয়া অগ্রসর হইল। উপরের ঘরে গিয়া রহমন দেখিল, তাড়াতাড়িতে পিয়ারা তাহার গাত্রাচ্ছাদন কেদারার উপর ফেলিয়া গিয়াছে। জাহির যদি তাহা দেখিয়া চিনিতে পারে! আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের জন্য সে আপনাকে প্রস্তুত করিতে লাগিল।

জাহির এক হাত টেবিলের উপর রাখিয়া তাহার ধারে দাঁড়াইল। তাহার দৃষ্টি রহমনের মুখের উপর নিবদ্ধ। জাহির মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। রহমনের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিল, জাহির বোধ হয় সব জানিতে পারিয়া এখানে তাহার স্ত্রীর অন্বেষণে আসিয়াছে। কিন্তু মুখের ভাবে ত রাগ বা হিংসার চিহ্নমাত্র প্রকটিত

নাই! এ কি প্রহেলিকা? গভীর সন্দেহ-দোলায় তাহার মন দুলিতে লাগিল।

"রহমন, দোস্ত, আমাকে একবার আলিঙ্গন কর! আমি বহুদিন তোমার স্পর্শসুখ অনুভব করি নি।"

রহমন বন্ধুকে কম্পিত কলেবরে আলিঙ্গন করিল। জাহির তখন তাহার হাত জড়াইয়া ধরিয়া করুণস্বরে বলিল,—"আজ এত দিন পরে এই পুরাতন স্থানে বন্ধুর সঙ্গে আলিঙ্গন কি সুখের! হায়, আজ যদি আমি দৃষ্টিশক্তি না হারাতাম!"

রহমন চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এ সব কি বলছো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

জাহির ধীরে ধীরে বলিল,—"তা ত ঠিক; তুমি সে কথা জান্‌বে কি করে ভাই! এই যে চোখ দেখছো, নীল, আকর্ণ বিস্তৃত,—কিন্তু সব অন্ধকার, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। যতদিন বেঁচে থাকবো, কিছুই দেখ্‌তে পাবো না। অচেনা পথে যখন চলি, তখন পা টলতে থাকে; মদ না খেলেও লোকে মনে করে আমি মাতাল হয়েছি। কিন্তু এ বাড়ীতে আসতে আমার একটুও কষ্ট হয় নি; এ যে আমার চির-পরিচিত স্থান! তাই, তোমার কাছে এসে, আজ মনে তবু অনেকটা শান্তি পাচ্ছি। অনেক চেষ্টা করে,

প্রাণের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করে তবে আজ এখানে আসতে পেরেছি। এ মুখ যে আর তোমাদের দেখাতে পারবো, সে দুরাশা হৃদয় থেকে একেবারে দূর করেই দিয়েছিলাম। একটু বসি; তোমার সঙ্গে ভাই অনেক প্রাণের কথা আছে। সে সব কথা আর কা'কেও সাহস করে বলতে পারি নি। এক গ্লাস জল দাও, গলাটা বড় শুকিয়ে গেছে। তুমি কথা কচ্ছো না কেন? তোমার হয়েছে কি? এসে পর্য্যন্ত যে তোমার মুখে একটা কথাও শুনতে পাই নি। খুব রাগ হয়েছে আমার ওপর—নয়? তা ত হবারই কথা!"

রহমন হতবুদ্ধি হইয়া বন্ধুর মুখের দিকে এতক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়াছিল। এমন পদ্মকোরকের ন্যায় নীল বিস্তৃত চক্ষুর্দ্বয়! এ ব্যক্তি অন্ধ? তাহাও কি বিশ্বাস হয়! নিশ্চয়ই দৃষ্টিশক্তিহীনতার ভাণ করিয়া আমার সহিত প্রতারণা করিতেছে। পিয়ারা বোধ হয় ঘরের ভিতর হইতে সব বুঝিতে পারিতেছে। সে যদি একটু সাবধান হয়, তবেই আজ বন্ধুর নিকট মানরক্ষা! নচেৎ এক্ষেত্রে আত্মরক্ষা অসম্ভব। কিন্তু পূর্ব্বে উহার মুখে যে একটা উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ছিল, আজ তাহা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে দেখিতেছি।' জাহিরের প্রশ্নে তাহার চৈতন্য হইল। বুঝিল, এখন চুপ করিয়া

থাকিলে বন্ধুর মনে সন্দেহের মাত্রা নিশ্চয়ই ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে।

"জাহির, কি আর বলবো? তোমার ভাবগতিক দেখে, আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। তুমি যে চোখে দেখতে পাও না, তা আমি পূর্ব্বেও বুঝতে পারি নি, এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। এ কথা কি সত্য?"

"এ কথা সত্য। দুরদৃষ্টবশতঃ আমি যথার্থই আজ দৃষ্টিশক্তিহীন। আমি নিজেই প্রথম বুঝতে পারিনি, কি ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন আমার হয়েছে! জীবনে কি ভীষণ মৃত্যুদণ্ড স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছি। তুমি জান না আজ এখানে আসবার পূর্ব্বে আমি কত ইতস্ততঃ করেছি। এ অবস্থায় তোমাদের সম্মুখীন হ'তে আমার মনে বড়ই কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পরে ভাবলাম, আমার দুঃখ কষ্ট ভোগের কথা শুনলে তুমি নিশ্চয়ই সহানুভূতি প্রকাশ করবে। রহমন, আমার ভীষণ অধঃপতন হয়েছিল। শয়তান আমার ঘাড়ে চেপে বসেছিল। সংসর্গদোষে একেবারে পাপের পঙ্কিল সাগরের তলদেশে ডুবে গেছলাম; সবেমাত্র দু' এক দিন হ'ল আবার সমুদ্রবক্ষে ভেসে উঠেছি। আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছিল; এখন আবার একটু আধটু প্রকৃতিস্থ হয়েছি বলে মনে হয়। প্রবল ইন্দ্রিয়ের

বিরুদ্ধে আমাকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল, কিন্তু ক্ষতবিক্ষত হয়েও আল্লার কৃপায় আজ আমি রণে জয়ী হয়েছি। আশা করি, ভবিষ্যতে আর কখনও আমার এমন পতন হবে না! কিন্তু ভাই, পাপের বড় ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে,—অমূল্য চক্ষুরত্ন আমার চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে!

"সঙ্গদোষে স্বভাবচরিত্র উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। ঘোর অত্যাচার ও অনাচারের ফলে নানাবিধ কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে দৃষ্টিশক্তির পীড়া জন্মে। পরে অর্থাভাবে হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় দৃষ্টিশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। পূর্ব্বে যদিও মধ্যে মধ্যে গৃহে ফিরিবার কথা ভাবতাম, কিন্তু অন্ধ হওয়ার পর হ'তেই সে দুরাশা একেবারে ত্যাগ করি। যাদের মনে অশেষ দুঃখকষ্ট দিয়ে, একপ্রকার নিঃসহায় অবস্থায় ফেলে চলে আসি, আজ অন্ধ হয়ে কোন্ সাহসে আবার তা'দের গলগ্রহ হয়ে সেবা শুশ্রূষা ভোগ করতে যাব! দৃষ্টিশক্তি হারাবার পর হতেই আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হয়; কিন্তু তখন আর উপায় নেই! হায়, আল্লা কেন পূর্ব্বেই আমার চৈতন্য করাইয়া দেন নাই! কিন্তু তাহ'লে ত আর আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হত না!"

বাল্যের পুরাতন বন্ধুর নিকট মনের ভার লাঘব করিয়া, জাহির অনেকটা শান্তি অনুভব করিল। দু' এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে আবার বলিতে লাগিল,—"ভাই, স্থির করেছি আর সংসারে প্রবেশ করব না। ফকিরের বেশ ধরে দূরদেশে আল্লার নাম করে ঘুরে বেড়াব। চক্ষু হারিয়েছি, স্ত্রীকন্যার ভালবাসা স্নেহলাভে বঞ্চিত হয়েছি, এতেও বোধ হয় আমার পাপের উপযুক্ত শাস্তি হয় নি। তাই খোদার নাম করে, অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করবো মনে করেছি। চিরদিনের জন্যে স্ত্রী কন্যা ত্যাগ করে যেতে মনের মধ্যে যে কি কষ্ট হচ্ছে, তা তুমি বুঝতে পারবে না। শিশুকন্যার জন্য প্রাণ কত কাতর হয়, তা মুখে বল্লে বিশ্বাস করবে না ; যদি হৃদয় চিরে এ যন্ত্রণা দেখাবার হ'ত, ত দেখাতাম ! এখনও মধ্যে মধ্যে এ অভাগার স্কন্ধদেশে তার কচি হাত দু' খানির কোমল স্পর্শ অনুভব করে তাপিত প্রাণ শীতল করি।—ও কি, কিসের শব্দ ?"

রহমন শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। পাশের ঘর হইতে উত্থিত স্ত্রীলোকের ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ! সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"না, না, ও কিছু নয় ; আমার কাশির শব্দ। কি বলছিলে, বল না।"

"আমি মক্কা যা'বার সঙ্কল্প করেছি। তাই একবার

লুকিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। ছেলেবেলা হ'তেই তোমার নিকট প্রাণের কথা কয়ে অনেকটা শান্তি পেতাম। তাই আজ আবার ছুটে এসেছি। একটু পরেই চলে যাব। আর যাবার সময় একবার স্ত্রীকন্যার সংবাদটা জানবার জন্যে প্রাণ বড় কাতর হয়ে উঠলো। তাদের চিন্তায় মক্কাতে গিয়েও আমি নিশ্চিন্ত মনে খোদার নাম করতে পারবো না! যদি কখনও সুবিধা পাও, আমার স্ত্রীকে এ সব কথা বুঝিয়ে বলো। তবে আমি চলে গেলে তা'রা দুদিন বাদে নিশ্চয়ই আমাকে ভুলে যাবে; তখন আবার সুখে স্বচ্ছন্দে নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করতে পারবে। আল্লা, তাদের সুখে রাখুন!"

জাহির চুপ করিল। মানসিক যন্ত্রণায় তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। চক্ষু দিয়া টস্‌টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। রহমন তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল,—"ভাই, তুমি বাড়ী ফিরে যাও। কেন, বৃথা এ সব সন্দেহ করছো? আমি বেশ জানি, তুমি চলে যাওয়াতে, তোমার স্ত্রী তোমার জন্যে বড়ই কাতর হয়ে পড়েছে। তুমি এ অবস্থাতেও ফিরে গেলে, সে দাসীর ন্যায় প্রাণপণ তোমার সেবা করবে, এ তুমি স্থির জেনো। আর স্ত্রী কন্যার বিষয়ও ত তোমার ভাবা উচিত। তা'রা এখন কিরূপ নিঃসহায় অবস্থায় আছে,

একবার ভাব দেখি। তোমার অবস্থায় পড়লে, আমি নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরে যেতাম।"

"রহমন, তোমার কথা শুনে, আবার আমার ঘরে ফিরে যেতেই লোভ হচ্ছে। একবার পিয়ারার নিজমুখে শুনতে ইচ্ছা যায় যে, তা'কে এত দুঃখ কষ্ট দিলেও, সে এখনও আমাকে ভালবাসে, আমার প্রতি সে এখনও অনুরক্ত। ভাই, আমাকে দেখলে কি সে যথার্থই সন্তুষ্ট হবে? ভাই, বন্ধুর সঙ্গে প্রতারণা করো না। সত্য কথা খুলে বল। একে ত দারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে মরছি, তা'র ওপর যদি আবার বাড়ী গিয়ে স্ত্রীর উপেক্ষা ও অবহেলা সহ্য করতে হয়, তা'হলে বোধ হয় আমাকে আবার আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হ'তে হবে!"

"না, না, কোনও ভয় নেই। আমি যা বলছি, সব সত্য। তুমি নড়ো না; চুপ করে বস। আমি এখনই আসছি।" রহমনের ভয় হইল, পাছে জাহির এখনই স্ত্রীর অবর্ত্তমানে বাড়ী চলিয়া যায়। তা'হলেই ত পুনর্ব্বার বিপদপাতের সম্ভাবনা। সে পাশের ঘরের দরজার নিকট গিয়া পিয়ারাকে বাড়ী যাইতে সঙ্কেত করিল। এমন সময় স্কন্ধদেশে কাহার স্পর্শ অনুভব করিয়া সে চমকিয়া উঠিল; ফিরিয়া দেখে, জাহির! সর্ব্বনাশ, তবে কি সত্যই সে অন্ধ

নহে, তাহাদের অভিসন্ধি ধরিবার জন্ম এতক্ষণ ছল করিতে-ছিল! তাহার সমস্ত দেহ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। সে-কম্পিতস্বরে বলিল,—"একি, তুমি কেমন করে এখানে এলে? এই বল্লে চোখে একদম দেখ্‌তে পাও না!"

"ভাই, এ স্থান যে আমার বড় পরিচিত! তোমার পায়ের শব্দ অনুসরণ করে আমি এখানে এসেছি। এ বাড়ীর তুমি যেখানে যেতে বলবে, আমি সেখানেই যেতে পারি। আচ্ছা দেখ, এই পাশের ঘরে গিয়ে টেবিল থেকে তোমার একখানা বই আনছি, টেবিলের ওপর বই পাব ত?"

রহমন নিষেধ করিবার পূর্ব্বেই জাহির ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। রহমনের অন্তরাত্মা দুরু-দুরু কাঁপিতে লাগিল। সব বুঝি বিফল হইল! সে মনে মনে আল্লার নাম স্মরণ করিতে লাগিল। তাহাদের ষড়যন্ত্র ত সব বাহির হইয়া পড়িবেই; তাহার উপর এ দৃশ্য দেখিলে জাহিরেরও জীবনের সকল সুখ শান্তিই একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে! আল্লা কি তাহার দোষ ক্ষমা করিয়া তাহাদের দু'জনকেই এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন না!

জাহির ঘরের ভিতর ঢুকিল। টেবিলের পাশেই চেয়ারে তাহার স্ত্রী বসিয়াছিল। স্বামীকে নিকটে আসিতে

দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার পাশ কাটাইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। সেই সময় বোধ হয় তাহার বস্ত্রাঞ্চল জাহিরের গাত্রস্পর্শ করিয়াছিল। অন্ধ স্বামী কিছুই টের পাইল না। আল্লা যে তাহার অমূল্য চক্ষুরত্ন চির-দিনের জন্য নষ্ট করিয়া দিয়াছেন, আজ তাহার সার্থকতা রহমন ও পিয়ারা লক্ষ্য করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল!

পিয়ারা বাহিরে আসিয়া গাত্রাবরণ তুলিয়া লইয়া রহমনকে চুপি চুপি বলিল,—"খোদা তোমার মঙ্গল করুন! তুমি শীঘ্র ওকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমি সেখানে ওর জন্য অপেক্ষা করে বসে থাক্‌বো।" বলিয়াই সে তীরের ন্যায় বেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

জাহির হাসিতে হাসিতে পুস্তক হস্তে হাজির হইল। বন্ধুর হাতে বইখানি দিয়া বলিল,—"দেখলে, যা বলেছি, তা ঠিক কিনা? কিন্তু কি আশ্চর্য্য রহমন, আমার মনে হলো, ঘরের ভেতর থেকে কে যেন আমার গা ছুঁয়ে চলে গেল। কেউ কি তোমার সঙ্গে কিছু পূর্ব্বে কথা বলছিল? আমি যেন ঘরের ভেতরে অন্য ব্যক্তির মৃদু কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পাচ্ছিলাম!"

"জাহির, এ সবই তোমার ভ্রান্তি মাত্র। এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, একজন সঙ্গী তোমার বিশেষ

দরকার। নচেৎ যে কদিন বেঁচে থাক্‌বে, তোমার কষ্টের সীমা থাকবে না। এ অবস্থায় স্ত্রী ভিন্ন আর কেউই তেমন সযত্নে তোমার তত্ত্বাবধান কর্‌তে পার্‌বে না। একটু বস, স্থির হও; দুশ্চিন্তা মন থেকে দূর করে দাও। বিশ্রামের পর গাড়ী ডেকে আমি তোমাকে বাড়ী রেখে আস্‌বো।"

"ভাই, তাই হোক্! আমার কোনও আপত্তি নেই।"

ঝাঁজির টাকা।

(১)

পিতা যেদিন নাতি-নাতিনীর মুখ দেখিয়া উপার্জ্জনহীন পুত্রের উপর সংসারের ভার ও সহস্র মুদ্রা ঋণের বোঝা চাপাইয়া হরিনাম করিতে করিতে মানবলীলা সম্বরণ করেন, রমেশবাবু সেদিন পৃথিবী অন্ধকার দেখিলেন।

রমেশের বয়স যখন ষোল কি সতর সেই সময় তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তিনি তখন স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়েন। পিতা আর বিবাহ না করিয়া অল্প বয়সেই পুত্রের বিবাহ দিয়া রাঙ্গা বৌ ঘরে আনেন। বিবাহের পরও তিনচার বৎসর পড়াশুনার অভ্যাস রাখিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর প্রবেশলাভ করা তাহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। মা ষষ্ঠী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেও, লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুজনেই একযোগে যেন তাঁহার প্রতি বিমুখ হইলেন। বিদ্যালয় ত্যাগের পর পিতা পুত্রের একটি চাকুরির জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু চাকুরি কোথাও মিলিল না। তাঁহার সামান্য আয়ে সংসার চালান দুষ্কর হইয়া উঠিল, কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে দেনা করিতে হইল।

মনে করিয়াছিলেন, পুত্র কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিলেই এ দেনা শুধিয়া দিবেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঋণ পরিশোধ করা দূরের কথা, সুদে ও আসলে তাহা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। এমন সময় পিতা একদিন সৌভাগ্যের জোরে ভবযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। ভগবান তখন যেন রমেশবাবুর দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার উপর কৃপাদৃষ্টি করিলেন। গ্রাম্য ছাত্রবৃত্তি স্কুলে বিশ টাকা মাহিনায় এক শিক্ষকের পদে তিনি নিযুক্ত হইলেন। এই অল্প বেতনে এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে সংসার চালান কিরূপ কষ্টকর, তাহা ভুক্ত-ভোগীমাত্রই জানে ; এ সত্ত্বেও দু'চার বৎসর কোন রকমে কষ্টেস্‌ষ্টে সংসার চলিল। কিন্তু এদিকে ঋণের সুদ দিন দিন বাড়িতে লাগিল, প্রথমা কন্যাও পাওনাদারের ন্যায় যেন পিতার সহিত বাদ সাধিয়া মাথাঝাড়া দিয়া উঠিল। দু' বৎসর পরে তাহারও বিবাহের উদ্যোগ করিতে হইবে। পিতৃঋণ ও কন্যাদায় লইয়া তিনি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। শয়নে স্বপনে সর্ব্বদাই এই দুই চিন্তা তাঁহার হৃদয়ের রক্ত শোষণ করিতে লাগিল। তিনি উদ্ধার লাভের কোনও উপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

আজও সন্ধ্যায় তাঁহার স্ত্রীর সহিত এ বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে রমেশবাবুর মাথা গরম হইয়া উঠিয়া-

ছিল। এমন সময় তাঁহার এক বন্ধু আসিয়া ডাকিল। রাত্রে জমীদার বাবুর বাড়ী দুইজনের একত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার কথা ছিল। রমেশবাবু চিন্তাভারাক্রান্ত অন্তঃকরণে বন্ধুর সহিত বহির্গত হইলেন।

যথা সময়ে তাঁহারা জমিদার কৃষ্ণলালবাবুর বাড়ী উপস্থিত হইলেন। প্রকাণ্ড বাসভবন পত্রপুষ্পে শোভিত হইয়াছে। উজ্জ্বল আলোকমালায় সমস্ত বাড়ীটি উদ্ভাসিত; উন্মুক্ত-গবাক্ষ-নিঃসৃত মধুর সঙ্গীতধ্বনি পথিকের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছে।

কৃষ্ণলালবাবুর গিরিধিতে অনেকগুলি অভ্রখনি আছে। তাহা হইতে তাঁহার মাসিক বিস্তর আয়। সকল প্রকার পার্থিব সুখ-সম্পদের তিনি অধিকারী। আজ তাঁহার বাড়ীতে খুব জাঁকজমকের সহিত প্রীতিভোজ হইতেছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ বাড়ীর শোভা ও ভোজের প্রচুর আয়োজন দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সকল প্রকার ও সকল শ্রেণীরই লোক উপস্থিত আছেন,—ডাক্তার, উকিল, হাকিম, সংবাদপত্রের সম্পাদক সকলেই নিমন্ত্রণে যোগদান করিয়াছেন। যে যাহার পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সহিত আলাপ করিতে ব্যস্ত; এমন সময় অদূরে দুই ব্যক্তির মধ্যে মহা তর্ক

বাধিয়া উঠিল। উপস্থিত সকলেই সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

কৃষ্ণলালবাবু বলিতে লাগিলেন, "যাবজ্জীবন নির্জ্জন কারাবাস, প্রাণদণ্ড শাস্তির অপেক্ষা কোন অংশে কম নিষ্ঠুর বা কষ্টকর নয়। প্রথমটা শুনতে ভাল হতে পারে, কিন্তু ফলে দুই সমানই। তাই আমার মত যে, প্রাণদণ্ডের আদেশ উঠিয়ে দিয়ে নির্জ্জন কারাবাস শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।"

হাকিম হরিহরবাবু উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিলেন, "এ বিষয়ে আমার মত বিভিন্ন। শিরশ্চেদনের পরিবর্ত্তে নির্জ্জন কারাবাসের শাস্তি দিলে কুফল ফলবে। পাপ ও পাপিষ্ঠের সংখ্যা হু-হু করে বেড়ে যাবে। নির্জ্জন কারাবাসে পাপিষ্ঠেরা আদৌ ভয় পাবে না। তারা জেলরক্ষকের চোখে ধূলি দিয়ে পালিয়ে যাবে।"

কৃষ্ণলালবাবু উত্তর করিলেন, "নির্জ্জন কারাবাস কি যথেষ্ট ভীতিপ্রদ নহে? এর চেয়ে বেশী কষ্টকর আর কি হতে পারে? একবার ভেবে দেখুন,—নির্জ্জন ঘর, কাছে কেউ নেই; কারু সঙ্গে একটি কথা কইবারও উপায় নেই; একেবারে মুখ বন্ধ করে থাকতে হবে। জেলরক্ষক ভিন্ন অপর কোন মানুষের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ

থাকবে না। একবার ব্যাপারটা মনে মনে কল্পনা করুন দেখি!"

"সমাজ-সংস্কার" পত্রের সম্পাদক তিনকড়িবাবু আন্তরিক ঘৃণার সহিত তাঁহাদের তর্ক শুনিতেছিলেন; আর স্থির থাকিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "প্রাণদণ্ড শাস্তি কিছুতেই সমাজে থাকা উচিত নয়; একজন লোক আর একজনের চেয়ে যত বেশী ক্ষমতাশালীই হউক না কেন, প্রাণদণ্ড দেবার তাঁর কোন অধিকার নেই।"

হরিহরবাবু বলিলেন, "সমাজ আর কি করবে? চোর ডাকাতদের অত্যাচার হতে আপনাকে কোন প্রকারে রক্ষা করতে হবে তো? কারাবাসটা অনেকের কাছে কিছুই নয়, সেখানে তারা মাথা গুঁজবার স্থান পায়; ঝড়, বৃষ্টি, প্রচণ্ড শীত হতে নিস্তার পায়, খাবার কোন ভাবনা থাকে না, একমুঠা চালের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াতে হয় না। কত হতভাগ্য লোক এরূপ আশ্রয় পেলে আপনাদের ধন্য মনে করে।"

কৃষ্ণলালবাবু বলিতে লাগিলেন, "নির্জ্জন কারাবাসের যে কি কষ্ট তা যথার্থ ভোগ না করলে আপনি বুঝতে পারবেন না। আপনাকে এটা পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিতে হবে। আজ এখানে সমবেত সকল লোককেই আমি এই

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য আহ্বান করছি। যিনি এক বছর স্বেচ্ছায় নির্জ্জন কারাবাসযন্ত্রণা ভোগ করতে সম্মত হবেন, আমি তাঁকে তিন হাজার টাকা পুরস্কার দেবো।"

কৃষ্ণলালবাবু যে একটু খামখেয়ালী তাহা সকলেই জানিতেন। তাঁহার এই প্রস্তাব শুনিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সমস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কৃষ্ণলালবাবু তখন দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"এতে হাসির কথা কিছুই নেই। আমি সত্যই এ প্রস্তাব করছি। আপনারা কেহ পরিহাস বলে মনে করবেন না। আমি বেশ জানি, যিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হবেন, তাঁর কষ্টের সীমা থাকবে না। এমন কি অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তিনি আত্মহত্যাও করতে পারেন। কিম্বা এক মাসের মধ্যেই মুক্তির জন্য কাতর হতে পারেন। ভগবানের কৃপায় যদিই বা শেষ পর্য্যন্ত তিনি যুঝতে পারেন, তাহলেও তাঁহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে। তবু এটা আমার মতে একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত। তিন হাজার মুদ্রা পুরস্কার! আপনাদের মধ্যে যদি কেউ আমার প্রস্তাবে সম্মত থাকেন ত এগিয়ে আসুন।"

উপস্থিত সকলেই মুহূর্ত্তের জন্য নীরব হইলেন। তাঁহারা কথার ভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, গৃহস্বামী এ প্রস্তাব

পরিহাসচ্ছলে করিতেছেন না। এমন সময় ঘরের এক কোণ হইতে রমেশবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমি এ পরীক্ষা দিতে সম্মত আছি। আমি স্বেচ্ছায় আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।"

ঘরের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সবাই মাথা উঁচু করিয়া একদৃষ্টিতে যুবকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। সকলেই রমেশবাবুকে পাগল বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন। কেবল কৃষ্ণলালবাবু বিন্দুমাত্র বিস্মিত না হইয়া স্থিরদৃষ্টিতে যুবকের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বেশ, তাই হবে। আপনি তাহলে কবে হতে এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হবেন?"

রমেশবাবু বলিলেন, "আপনি যখন ইচ্ছা করেন। আমি এই মুহূর্ত্তেই প্রস্তুত আছি।"

"তা হলে এখনই। আপনি আসুন; আপনারাও আমার সঙ্গে চলুন।"

এই বলিয়া কৃষ্ণলালবাবু ভোজঘর ত্যাগ করিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলেই হতভম্ব ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্ব স্ব আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং ভূতাবিষ্টের ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কি ব্যাপার যে ঘটিবে সে বিষয়ে তাঁহাদের কোন ধারণা ছিল না। তাঁহারা তখন

মনে করিলেন, হয় ত বা লক্ষপতি গৃহস্বামীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে এবং ইহা তাঁহার একটা খেয়াল মাত্র। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ইতিপূর্ব্বে রমেশবাবুকে চিনিতেন না। এখন সকলে বিস্ময় ও দুঃখের সহিত তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার বয়স আন্দাজ আটাশ কি ত্রিশ, দেখিতে সুশ্রী ও বলিষ্ঠ, বদনমণ্ডল সুগঠিত, কোমল, অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

এমন সময় রমেশবাবুর বন্ধু ভয়ে বেতসপত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে নিকটে আসিয়া কাতরভাবে তাঁহাকে বলিলেন, "রমেশ, তুমি কি পাগল হয়েছ? কেন, এ কাজ করতে যাচ্ছ?"

কিন্তু রমেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্থির, গম্ভীরমূর্ত্তি; নীরবে তিনি গৃহস্বামীর অনুসরণ করিলেন।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ অনেকগুলি ঘর পার হইয়া বারান্দার উপর আসিয়া পড়িলেন। পরে বারান্দার পাশে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া একটি ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণলালবাবু পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া সেই ঘরের দরজা খুলিলেন। তিনি প্রথমে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া দিতেই সকলে দেখিলেন যে, ঘরটি একটি ছোটখাট কুটরিবিশেষ। ইহার দেওয়ালে একটিও জানালা নাই।

কিছু পরে কৃষ্ণলালবাবু সকলকে শুনাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এটা লেবরেটরি ঘর। ধাতুজ পদার্থের পরীক্ষার জন্ম আমি সম্প্রতি ইহা নির্ম্মিত করিয়েছি, মধ্যে মধ্যে দু'এক রাত্রি কেহ কেহ এই ঘরে বসে কাজও করে থাকে, ঐ গর্ত্তের ভেতর দিয়ে তাকে খাবার দেওয়া হয়। স্থানটি নিস্তব্ধ, নির্জ্জন। দরজা বন্ধ করে দিলে বাইরের কোন শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না। এই ঘরের বৈদ্যুতিক ঘণ্টার তারের সঙ্গে আমার উপরের তলায় বসবার ঘরের তারের যোগ আছে। এই তার টান্‌লেই সেখানে ঘণ্টা বাজবে। সে ঘরে প্রায় সমস্ত দিনরাতই এক জন না একজন লোক কাজ করে। এই ঘরের এক কোণে জলের কল আছে দেখতে পাবেন; দেওয়ালে আন্‌লায় কাপড় জামা তোয়ালে সবই আছে। বিছানার গদি চাদর সবই সাদা ধবধবে। আপনার কোন জিনিষের অভাব হবে না। ঘরের সব জিনিষই সাজান-গোজান রয়েছে।

"রমেশ বাবু, আপনি ভেতরে ঢুক্‌লেই দরজা বন্ধ করে দেবো। আজ থেকে এক বছর এ ঘরে চাবি দেওয়াই থাকবে। প্রত্যহ দু'বার দরজার গর্ত্তের ভেতর দিয়ে আপনাকে খাবার দেওয়া হবে, ঐখান দিয়েই সপ্তাহে এক-

বার আপনি ফরসা কাপড়চোপড় পাবেন। তবে আজ থেকে ঘরের ভেতরকার সব জিনিষ আপনাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ঘরের ভেতর কেউ ঢুকতে পাবে না।

"পড়বার জন্তে আপনাকে কোন বই দেওয়া হবে না। লেখবার জন্তে কালি কলম কাগজ কিছুই পাবেন না। কোন লোকের সঙ্গে বা বাইরের কোন জিনিষের সঙ্গে আজ থেকে আপনার কোন সম্বন্ধ থাকবে না।

"আর একটা কথা আপনাকে বলে রাখি,—সেটাই আসল কথা। ভাল করে মনে রাখবেন,—দিনে কিংবা রাত্রে যে কোন সময়ে যখনই এই নির্জ্জনবাস আপনার অসহ্য বলে মনে হবে, বৈদ্যুতিক ঘণ্টার কল টিপলেই কেহ না কেহ এসে আপনাকে মুক্ত করে দেবে। আর যদি, এই একবছর আপনি এখানে এরূপ অবস্থায় থাকতে পারেন তাহলে এক বছর পরে, ঠিক এই দিন এই সময়ে আমি আপনাকে নগদ তিন হাজার টাকা গুণে দেবো! উপস্থিত আপনাদের সকলকেই আমি এই চুক্তিপত্রের সাক্ষীস্বরূপ থাকতে অনুরোধ করছি। পর বৎসর ঠিক এই তারিখে এ বাড়ীতে আপনাদের সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ করে রাখলাম। তবে ইতিমধ্যে রমেশবাবু স্বেচ্ছায় যদি এই

চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গ করেন, তা হলে আমার কোন দোষ নেই। সেরূপ ঘটলে যথাসময়ে সে কথা আপনাদের জানাব।

"তাহলে কাল বিলম্বে আর প্রয়োজন নেই। রমেশ বাবু, আপনি যদি প্রস্তুত থাকেন, তাহলে আপনাকে চাবি বন্ধ করে যাবো। রাত্রি অনেক হল। ভগবান, আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন করুন!"

রমেশবাবু অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া মরিয়া হইয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। এত দ্রুত এই সব ঘটনা ঘটিল দেখিয়া তিনিও একটু হতভম্ব হইয়া গেলেন।

ঋণগ্রস্ত পিতৃ-আত্মা যেন তাঁহাকে এ কার্য্যে উৎসাহিত করিয়া বলিল,—"আমাকে মুক্ত কর! আর কষ্ট সইতে পারি না।"

এখানে আসিবার পূর্ব্বে স্ত্রীর সেই পাংশুবদন ও অশ্রু-ভারাক্রান্ত চক্ষুর্দ্বয়, পরক্ষণেই তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। সে বিষাদকাতর মুখখানি রমেশবাবুর কাছে তখন বড়ই সুন্দর দেখাইল, কে জানে হয় ত বা জীবনে তাহার সহিত আর দেখা হইবে না। পুত্রকন্যার হাসিমুখ দেখা তাঁহার ভাগ্যে আর নাও ঘটিয়া উঠিতে পারে! তাহা-দের সুখী করিবার জন্য, এই তুচ্ছ যন্ত্রণা সহ্য করিতে,—স্বার্থ বলি দিতে পারা যায় না কি? রমেশবাবু বোধ হয়

তাহাই ভাবিতেছিলেন। তাই কৃষ্ণলালবাবুর প্রস্তাবে তিন সহস্র মুদ্রা পুরস্কারের কথা শুনিয়া তিনি হাতে স্বর্গ পাইয়াছিলেন। এমন সুবিধা কিছুতেই ত্যাগ করা উচিত নহে। তিনি হাসিমুখে বিপদ আলিঙ্গন করিয়া লইলেন।

দরজা বন্ধ হইয়া গেল। ঘরের মধ্যে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। বাহিরের লোকের সহিত আজ হইতে তাঁহার সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি আজ স্বেচ্ছাদণ্ডিত! প্রত্যাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের পদশব্দও তিনি শুনিতে পাইলেন না। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া হতাশ ভাবে বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলেন।

---

(২)

এক বৎসর আজ পূর্ণ হইবে। রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। সেই নির্জ্জন ঘরের টেবিলের উপর রমেশবাবু বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার চক্ষু কোটরগত, রক্তবর্ণ গণ্ডস্থল বিবর্ণ ও দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীর্ণ, মাথার চুল ও দাড়ী দীর্ঘ ও জটাবদ্ধ। দেওয়ালে একটি ঘড়ি টিক্‌টিক্ করিতেছিল। তাহার উপর রমেশবাবুর উন্মত্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ, যেন চক্ষু দিয়া ঘড়িটিকে গ্রাস করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইতেছে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে মিনিট গণিতেছেন—এক, দুই, তিন।

তাঁহাকে এখন আর আদৌ চিনিতে পারা যায় না। তাঁহাব চেহারা দেখিলে তাঁহাকে পাগল বা পথের ভিখারী বলিয়া মনে হয়, কিংবা এই দুয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন এক অদ্ভুত জীব। এই দীর্ঘ একবৎসর তাঁহাকে যে কি কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা ঘরের টেবিল সাক্ষ্য দিতেছে। টেবিলের উপর ছুরি দিয়া সারি সারি নানা দেব দেবীর নাম লেখা। প্রথম পঙ্‌ক্তির নামগুলি বেশ সুন্দর ও স্পষ্ট খোদিত হইয়াছে, কিন্তু ক্রমেই অক্ষরগুলি

আঁকাবাঁকা ও অস্পষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শেষের হরপগুলি কাঠের উপর আঁচড়মাত্র, পড়িয়া কিছুই বুঝিবার জো নাই।

এমন সময় দরজায় কে ধাক্কা মারিল। রক্ষক গর্ত্তের ভিতর দিয়া খাদ্যের থালা ঢুকাইয়া দিল। মুহূর্ত্ত পরেই সে রমেশবাবুর সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিল। রমেশ-বাবুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আজ এক বৎসর পরে তিনি এই প্রথম মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। রক্ষক বলিল, "মশায়, সময় শেষ হয়ে এলো বলে, এখন নিয়মভঙ্গ করলে কোন দোষ নেই। আপনার সৌভাগ্যের জন্য আমি প্রথম আনন্দপ্রকাশ করতে ইচ্ছা করি। আর মাত্র এক ঘণ্টা আপনাকে বিলম্ব করতে হবে, তারপর তিন হাজার টাকা নগদ পুরস্কার পাবেন। অনেক লোক এখন থেকেই দল বেঁধে বাড়ীর চারিদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর একটু সহ্য করুন, সময় শেষ হলো বলে।"

ইহার উত্তর দিতে রমেশবাবুর বড় কষ্ট বোধ হইল। তবে কি সত্য সত্যই তাঁহার বাক্‌শক্তি লোপ পাইতে বসিয়াছে, অনেক চেষ্টার পর তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল,—"ধন্যবাদ।"

তাঁহাকে কেবল আর এক ঘণ্টামাত্র অপেক্ষা করিতে

হইবে। এক বৎসরের তুলনায় ইহা কত তুচ্ছ, কিন্তু ইহাই যে শেষ রক্ষা করিবে। জীবনের সকল পরীক্ষারই শেষ কয়েক মুহূর্ত্ত বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। রমেশবাবু এই শেষ রক্ষা করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন। রক্ষকের উপর তাঁহার বিষম ক্রোধ হইল। কেন সে তাঁহাকে এ কথা জানাইয়া গেল। কে উহাকে কথা বলিতে সাধিয়াছিল? জলাশয় দেখিলে তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির অবস্থা যেরূপ হয়, রমেশবাবুর অবস্থাও তদ্রূপ হইল। স্রোতের মুখে তৃণ-খণ্ডের ন্যায় তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ বুঝি এবার ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হাত দু'খানি উত্তপ্ত মাথার উপর রাখিয়া সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যে দ্রুত পায়চারি করিতে লাগিলেন। এক বৎসরের মধ্যে একটি দিনও তাঁহার নিকট এরূপ অসহ্য বলিয়া মনে হয় নাই।

চুম্বক যে ভাবে লৌহকে আকর্ষণ করে, দেওয়ালে সংলগ্ন বৈদ্যুতিক ঘণ্টার কলটী যেন কত লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে সেই ভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কলটি টিপিবার জন্য তাঁহার ডান হাতখানি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনের বল যেন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তিনি যে তিন হাজার মুদ্রা পুরস্কার

লাভ করিতে পারিবেন এবং সেই অর্থে যে তাঁহার পিতৃ-ঋণ পরিশোধ হইবে, তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে পারিবেন, সে চিন্তা আর তাঁহার মনের মধ্যে উদিত হইল না। যে আশা এই এক বৎসর তাঁহাকে উৎফুল্ল ও উৎসাহিত করিয়া রাখিয়াছিল, যে আশার উজ্জ্বল আলোকের পানে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া তিনি এই এক বৎসর ভীষণ নির্জ্জনকারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, সে সমস্তই তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া গেল। তিনি কিরূপে এই স্বল্পপরিসর ঘর হইতে বাহির হইবেন, ইহাই তাঁহার এক-মাত্র চিন্তার বিষয় হইল।

একবার তাঁহার শীর্ণ অঙ্গুলী কলের তার প্রায় স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু অনেক কষ্টে তিনি আপনাকে সামলাইয়া লইলেন এবং নিষ্ঠুর প্রলোভনের হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিলেন। অল্পক্ষণ পরে পুনর্ব্বার তারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই কলটা তাঁহাকে টিপিবার জন্য প্রলোভিত করিতেছে দেখিয়া তাহার উপর তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন। টেবিলের উপর হইতে ছুরিখানি তুলিয়া লইয়া তিনি একখানি চেয়ারের উপর উঠি-লেন, এবং বিশেষ বলপ্রয়োগ করিয়া প্রাচীরগাত্রসংলগ্ন কলের তারগুলি টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন।

শত্রুবিজয়ী বীরের ন্যায় এইবার তিনি বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মস্তিষ্কের আলোড়ন থামিয়া গেল, তাঁহার অন্তঃকরণ শান্তভাব ধারণ করিল। তিনি আরামের সহিত নিঃশ্বাস ফেলিলেন। স্থিরভাবে টেবিলের উপর বসিয়া ঘড়ির দিকে তাকাইয়া আবার তিনি স্ত্রী পুত্রের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ হওয়ায় তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। তবে কি তাঁহার মুক্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে? না, না, এখনও ত নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয় নাই, ঘড়ির কাঁটায় যে এখন সবে দশটা বাজিয়া পঁচিশ মিনিট মাত্র হইয়াছে।

এমন সময় কৃষ্ণলালবাবু ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পরে ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করিয়া রমেশবাবুর নিকট দৌড়াইয়া গেলেন এবং খুব জোরে তাঁহার হাত ধরিয়া নাড়া দিলেন। কৃষ্ণলালবাবুর চেহারায় যেন কি একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! তাঁহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষুর্দ্বয় ঘোর রক্তবর্ণ। তাঁহাকে দেখিলেই উন্মাদ বলিয়া মনে হয়।

রমেশবাবুর হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন, তজ্জন্য আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। আমিই বাজি হেরেছি। সময় শেষ হয়-হয়;

বোধ হয় আধ ঘণ্টা বা আরও কম সময় বাকি আছে। এক বছরের তুলনায় সে কিছুই নয়। কিন্তু আপনাকে আমার কিছু বলবার আছে। একটা কাজ আপনাকে করতে হবে, কিন্তু ভয়ঙ্কর কাজ! তবু করতেই হবে। আপনাকে এখনই বৈদ্যুতিক ঘণ্টার কল টিপতে হবে; না টিপলে আপনার অমঙ্গল নিশ্চিত।"

রমেশবাবু ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কেন ঘণ্টা বাজাতে হবে?"

কৃষ্ণলালবাবু উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "আপনাকে বাজাতেই হবে। ঘণ্টা বাজলে সবাই বুঝতে পারবে যে আপনি শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। অমন করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন কেন? আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছেন না? আচ্ছা আমি বুঝিয়ে বলছি, শুনুন।"

রমেশবাবুর ক্রমশঃ চৈতন্য হইতে লাগিল। তিনি জড়তা ত্যাগ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণলালবাবু কম্পিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, আপনাকে এ কাজ করতেই হবে। অন্ততঃ বাইরের লোকদের দেখাতে হবে যে, আপনি অকৃতকার্য্য হয়েছেন, বাজি হেরেছেন।

আপনার প্রাপ্য পুরস্কার তিন হাজার মুদ্রা আপনি নিশ্চয়ই পাবেন ; না হয় আপনাকে আরও এক হাজার বেশী দেবো। কিন্তু আজ রাত্রে আপনি এ টাকা পাবেন না, কয়েক মাস পরে পাবেন। এখন আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে ; ধনে প্রাণে আমি মারা যেতে বসেছি।"

রমেশবাবু অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আপনার যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হয়েছে এ কথা ত সহজে বিশ্বাস হয় না। আপনি লক্ষপতি ; আপনার আবার কি সর্ব্বনাশ হতে পারে ?"

কৃষ্ণলালবাবু উন্মাদের ন্যায় চেঁচাইয়া উঠিলেন, "হাঁ সত্য কথা। তবে দুদিন ধৈর্য্য ধরে থাকলে সব শুধরে যাবে, পুরাতন ধন সম্পত্তি সব ফিরে আসবে। অভ্রের খনি থেকে আর অভ্র উঠছে না। আমি জোচ্চোরের হাতে প্রতারিত হয়েছি। আমাকে আবার টাকা দিয়ে নূতন খনি কিনতে হবে। কিন্তু আজ রাত্রে আপনাকে তিন হাজার টাকা দিলে, খনি কেনবার জন্য বেশী টাকা আমার আর থাকবে না। আমাকে তা হলে সর্ব্বস্বান্ত হতে হবে। পূর্ব্বের অবস্থা ফিরে পাবার আশা একেবারে ত্যাগ করতে হবে।"

রমেশবাবু এই কথা শুনিয়া হঠাৎ অট্টহাস্য করিয়া

উঠিলেন। তাঁহার দেহযন্ত্রের প্রত্যেক শিরা উপশিরা সে হাস্যে কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আপনাকে সর্ব্বস্বান্ত হতে হবে, আমার তাতে কি আসে যায়? আপনার অনেক টাকা আছে। অন্ততঃ আপনার বাড়ী, ঘোড়াগাড়ী আসবাব কত জিনিষ রয়েছে, যা বিক্রী করে আমার টাকা দিতে পারেন।"

কৃষ্ণলালবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "না, আমি ও সব বিক্রী করতে পারব না। তাহলে বাইরের জাঁকজমক, চালচলন আমার সব নষ্ট হয়ে যাবে। ক্রমে আমাকে পথের ভিখারী হতে হবে। রমেশবাবু, এগারটা বাজে বলে, শীগ্‌গির কলটা টিপে দিন। এগারটা বেজে গেলে আমার মান ইজ্জত সব যাবে। আপনাকে টাকা দিয়ে আমি তাহলে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করব।"

রমেশবাবুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তাহলে আপনি বলতে চান যে, আমি এক বৎসর এই যে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করলাম, সব বৃথায় যাবে। যদি জানতেন আমি কিরূপ মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করেছি, যা জীবন্ত সমাধি অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়, দিনের মধ্যে কতবার আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা প্রবল হ'ত তা যদি বুঝতেন, তা হলে আপনি নিশ্চয়ই একথা

বলতে পারতেন না। কেবল এক আশা আমাকে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। আপনি কি চিন্তা করতেও পারেন না দীর্ঘ এক বৎসর সঙ্গীহীন ও অলস অবস্থায় কালযাপন করা কত দূর কষ্টকর? একটু একটু করে সে পশুর মত হয়ে যেতে হয়। লেখাপড়া বোধ হয় ভুলেই গেছি। এই আপনার সঙ্গে কথা কইতে কত বাধ-বাধ ঠেকছে বলতে পারি না। এত কষ্ট করে আমি বাজি জিতেছি। আপনার এত দূর মূর্খতা ও হঠকারিতা যে, বাইরে নিজের সম্মান বজায় রাখবার জন্যে আপনি আমাকে এখন এই কাজ করতে বলছেন। শত বৃশ্চিক-দংশন অপেক্ষা বেশী যন্ত্রণা আমি সহ্য করেছি, তবু এ কল টিপিনি। আপনি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছেন, না'হলে কখনই এ কথা বল্‌তেন না।"

কুঞ্জলালবাবু বলিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করছি, দু' চার মাসের মধ্যেই আপনাকে টাকা দেব। এক হাজার টাকা বেশীও দেব শপথ করছি। যে ক'মাস না আমার ব্যবসার গোলযোগ সব মিটে যায়, সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন।"

"এ যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। কাল আপনি দেউলে বলে লাল বাতি জ্বালাতে পারেন। তখন আমার অবস্থা কি হবে?"

এবার কৃষ্ণলালবাবু করুণস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "রমেশ বাবু, একটু দয়া করুন। আমি আপনাকে অনুনয় বিনয় করছি, কিছু দিন অপেক্ষা করুন। আপনি যুবক, আমার ন্যায় পক্ককেশ বৃদ্ধের সর্ব্বনাশ সাধন করা আপনার কর্ত্তব্য নয়। তবে শুনুন, আসল কথা বলি; এ সব টাকাও আমার নয়, এক জনের গচ্ছিত টাকা। আর এতে যে কেবল আমার সর্ব্বনাশ হবে তা নয়। আমার অধীনস্থ শত শত দরিদ্র শ্রমজীবির অন্নসংস্থানের একমাত্র ভরসা নষ্ট হবে; তাদের কষ্টের সীমা থাকবে না; আমাকেও ধনে প্রাণে মারা যেতে হবে। আপনার এই নিষ্ঠুর এক-গুঁয়েমি ত্যাগ করুন। ভগবানের নাম করে বলছি, আমার কথা শুনুন, ঘণ্টাটা বাজান।"

রমেশবাবু উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "আমি বাজি জিতেছি, আপনাকে নিশ্চয়ই এই রাত্রে টাকা দিতে হবে।"

কৃষ্ণলালবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার শুষ্ক বদন-মণ্ডল ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। তিনিও উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তাহলে আমি ধনে প্রাণে মারা পড়ি, তোমার এই ইচ্ছে। তোমার দয়া ভিক্ষা করা আমার বোকামি হয়েছে! তুমি আধ পয়সাও পাবে না। আমি নিজেই ঘণ্টা বাজাচ্ছি।"

রমেশবাবু উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া কহিলেন, "খবরদার, ঘণ্টার দিকে এক পা অগ্রসর হয়েছেন কি আমি আপনাকে দরজার ভিতর দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।"

কৃষ্ণলালবাবু তবুও কলের তার স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইলেন। রমেশবাবু বাধা প্রদান করিলেন। দুজনের মধ্যে ঝটাপটি আরম্ভ হইল;—উভয়েই মরিয়া, জীবনসর্ব্বস্ব পণ করিয়া পরস্পরকে পরাভূত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রমেশবাবু এক বৎসর অবরুদ্ধ থাকায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও, তাঁহার যৌবনসুলভ বল ও সাহস পুনরায় দ্বিগুণভাবে তাঁহার দেহে ফিরিয়া আসিল। তাঁহার শিরার ভিতর দিয়া উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি তখন দেহে তিনজনের বল অনুভব করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণলালবাবুকে টেবিলের উপর তিনি হেলাইয়া ফেলিলেন, সেই সময় কৃষ্ণলালবাবু তাঁহার অলক্ষিতে টেবিল হইতে ছুরিখানা তুলিয়া লইলেন, এবং অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া রমেশবাবুর বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিয়া দিলেন।

রমেশবাবুর মুখ দিয়া কোনরূপ অস্ফুট যন্ত্রণাধ্বনি নির্গত হইল না। একটু পশ্চাতে হটিয়া আসিয়া কম্পিত

পদবিক্ষেপে একটু এপাশ ওপাশ টলিতে লাগিলেন, পরে আর ভর রাখিতে না পারিয়া মেজের উপর সটান শুইয়া পড়িলেন। ঘরের মধ্যে গম্ভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

কৃষ্ণলালবাবু তখন ভয়ে একটু সরিয়া গেলেন। পদ-তলে শায়িত রমেশবাবুর দেহের প্রতি একবার তাকাইলেন। তাঁহার মনে হইল ছুরিকাঘাতে বেচারীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! ইহাই কি দীর্ঘ কারাবাসের উপযুক্ত পুরস্কার!

এইবার তিনি নিজের দোষ ক্ষালন করিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি যে এ ঘরে ঢুকিয়াছেন, তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই, চলিয়া যাইবার সময়ও কেহ দেখিতে পাইবে না। তিনি স্থির করিলেন যে, ঘণ্টার কল টিপিয়াই তিনি চলিয়া যাইবেন এবং শব্দ শুনিয়া কেহ আসিতে না আসিতে অনায়াসে তাঁহার ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন। তিনি পাগলের ন্যায় ভীষণ জোরে কলের সাদা বোতামটী টিপিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া পলাইয়া গেলেন।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারটা বাজিল। কৃষ্ণলালবাবু সন্ধ্যাকালীন পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ভোজঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গত বৎসরের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ

পূর্ব্ব হইতেই উদ্বিগ্ন ভাবে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "চলুন, আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়েছে রমেশবাবুকে মুক্ত করে নিয়ে আসি।" তিনি পথ দেখাইয়া অগ্রসর হইলেন, সকলে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণলালবাবু চাবি দিয়া দরজা খুলিলেন। ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই তিনি চকিতভাবে একটু সরিয়া আসিলেন। তখনও রমেশবাবুর আহত বক্ষঃস্থল হইতে রক্তস্রাব হইতে-ছিল। উপস্থিত দর্শকগণের মুখ দিয়া অস্ফুট যন্ত্রণাধ্বনি নির্গত হইল।

তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "বেচারী দেখছি কিছু পূর্ব্বে আত্মহত্যা করেছে! হায়, হায়, সারা বছর ঠিক থেকে শেষ রক্ষা করতে পারলে না!" ঘর হইতে বাহিরে সর্ব্বত্র মুহূর্ত্তের মধ্যে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেল। যথাসময়ে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ভূলুণ্ঠিত দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এখনও শ্বাস বইছে। আপনারা সব গোল করবেন না।" সকলে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া উদ্‌গ্রীব নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এমন সময় হরিহরবাবু কৃষ্ণলালবাবুর পাশে বসিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "ডাক্তারের কথায় বেশ প্রমাণ হচ্ছে

যে, মাত্র কয়েক মিনিট পূর্ব্বে, রমেশবাবুর এ অবস্থা হয়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি বাজি জিতেছেন। অতএব পুরস্কারের টাকা এখনই আপনাকে দিতে হবে।"

কৃষ্ণলালবাবু বলিলেন, "টাকা আমি ঠিক দিতাম, যদি তিনি সময় উত্তীর্ণ হবার আগে ঘণ্টা না বাজাতেন! নিশ্চয়ই এগারটা বাজবার কিছু পূর্ব্বে তাঁর মাথা খারাপ হয়। কাজেই বেশ বোঝা যাচ্ছে, তিনি তার ধরে টেনে তারপর বুকে ছুরি বসিয়েছেন।"

তাঁহার দুই জন কর্ম্মচারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সমস্তক্ষণ উপরের ঘরে ছিলে ত, এগারটার কিছু পূর্ব্বে ঘণ্টার আওয়াজ শুনেছ নিশ্চয়? আমি তোমাদের ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ঘণ্টার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি।"

তাহারা বলিল, "আজ্ঞে ঘণ্টা ত বাজেনি; ঘণ্টা বাজলে আমাদের একজন নিশ্চয়ই তখনই নীচে নেমে আসত। আমরা এই মাত্র শুনলাম যে, এই ব্যাপার হয়েছে।"

কৃষ্ণলালবাবুর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "ইনি ঘণ্টা বাজান নি? আমি স্বকর্ণে ঘণ্টার শব্দ শুনেছি। তোমরা মিথ্যা কথা বলছ।"

উপস্থিত দর্শকবৃন্দের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। একজন বলিলেন, "কৃষ্ণলালবাবু, আপনার লোকেরাই বলছে ঘণ্টা বাজেনি। তাহলে আপনিই বাজি হেরেছেন।"

"মিথ্যা কথা! ওরা নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছিলো। আমি নিজে ঘণ্টা বাজতে শুনেছি। আপনারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে চান!" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার সমস্ত দেহ কাঁপিতে লাগিল। তিনি রোষকষায়িত নেত্রে কর্ম্মচারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"আমি শপথ করে বলছি যে ঘণ্টা বেজেছে। তোমরা দুজনে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আমি যা বলছি তা প্রমাণ করে দিতে পারি। আমি নিজেই ঘণ্টার তার ধরে টেনেছি!"

এই বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে বিকট রবে হাসিয়া উঠিলেন। এমন সময় বাহিরে গোলমাল শুনা গেল। জনকতক পুলিসের লোক ভিড় ঠেলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহারা একেবারে কৃষ্ণলালবাবুর পাশে গিয়া বলিল, "হাকিমের আদেশে আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করছি। গচ্ছিত টাকা নষ্ট করার অপরাধে আপনি অভিযুক্ত।"

হরিহরবাবুও তখন বলিয়া উঠিলেন, "আমারও আপনাকে রমেশবাবুর হত্যাপরাধে ধৃত করলাম।"

কৃষ্ণলালবাবু তাঁহাদের বাধা দিয়া বলিলেন, "সরে যাও। আমি সব স্বীকার করছি, তোমরা শোন। যে যে অপরাধে তোমরা আমাকে অভিযুক্ত করেছ, আমি যথার্থই সেই সব বিষয়ে দোষী; বাজি হেরেছি বুঝে ঐ ঘরে ঢুকে আমিই রমেশবাবুর বুকে ছুরি বসিয়েছি। এই নাও, বাজির টাকা আমি দিতে প্রস্তুত আছি।"

তাঁহার হাত বুকের উপর ছিল। ভিতরের পকেট হইতে হঠাৎ একটি ছোরা বাহির করিয়া, কেহ বাধা দিবার পূর্ব্বেই তিনি নিজের বুকে তাহা বসাইয়া দিলেন। একটা তীব্র আর্ত্তনাদে সমস্ত কক্ষ পূর্ণ হইয়া গেল। কৃষ্ণলালবাবুর রক্তাক্ত দেহ স্তম্ভিত দর্শকবৃন্দের সম্মুখে ভূমিতলে পতিত হইল। সকলে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যুগল বন্ধু।

(১)

আমি বাপমার একমাত্র পুত্র, সুতরাং অতীব প্রিয়পাত্র হইলেও আমার শিক্ষার উপর তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। পিতা ইষ্টইণ্ডিয়া রেল-কোম্পানীর মোগলসরাই ষ্টেসনের ষ্টেসনমাষ্টার ছিলেন; প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই তিনি কলিকাতায় রাখিয়া আমার কলেজে পড়িবার বন্দোবস্ত করিলেন। মেসে থাকিয়া পড়াশুনা করা তত সুবিধাজনক নহে ভাবিয়া, পিতা তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু সহরের একজন প্রসিদ্ধ দালাল হরিবাবুর বাড়ীতে আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহার পুত্র সতীশ আমার সমবয়স্ক,—সেও সেবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে। তাহা ছাড়া আমাদের দেহের গঠন, স্বভাবচরিত্র ও আচারব্যবহারও প্রায় এক রকমেরই ছিল। আমরা দুইজনে একপ্রকারেরই পোষাকপরিচ্ছদে সজ্জিত থাকিতাম। পরন্তু দুইজনে এক শয্যায় শুইতাম, একত্র আহারাদি ও ক্রীড়াকৌতুক করিতাম, এক সঙ্গে একই কলেজে পড়িতে যাইতাম। আমরা কদাচিৎ পরস্পরের সঙ্গ ত্যাগ করিতাম

এবং আমাদের অতি নিগূঢ় মনের কথাও পরস্পরের নিকট লুকাইতাম না। প্রতিবেশী ও পরিচিত ব্যক্তিরা অনেক সময়ই একজনকে মনে করিয়া অপরকে ভুল করিয়া বসিত ও বলিত আমরা একেবারে হরিহর-আত্মা, যেন দুই যমজ ভাই। অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের মধ্যে গাঢ় প্রণয়ের সঞ্চার হইল। হরিবাবুও আমাকে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে সুখে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। আমরা দুইজনেই তখন এল.এ, পাশ করিয়া বি,এ, পড়িতেছি। এমনই সময় একদিন দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনও কার্য্যোপলক্ষে হরিবাবুর এক বন্ধুর বাড়ী গিয়া তাঁহার ত্রয়োদশবর্ষীয়া রূপবতী কন্যাকে দেখিলাম,—সেই অবধি আমার প্রাণের মধ্যে একটা প্রবল বাসনার স্রোত বহিতে লাগিল। মনে হইল, যেন উহাকে না পাইলে, আমার সারা জীবনই ব্যর্থ হইবে। সেই মধুরোজ্জ্বল দৃশ্য দিনরাত আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি সেই দেবী প্রতিমার নিকট সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করিয়া ফেলিলাম। নিজের মনকে সংযত রাখিবার মত ক্ষমতা আমার তখন একেবারে লুপ্ত হইল। এ নূতন আসক্তির ক্রমবিকাশের প্রতি স্তর বর্ণনা করিয়া কোনও ফল নাই। তাহার পুনর্দর্শনের

লালসা আমায় উন্মত্ত করিয়া তুলিল। দিনরাত্র তাহারই চিন্তা ভূতের ন্যায় আমার ঘাড়ে চাপিয়া রহিল। অথচ এ কথা অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার উপায় নাই। এমন কি, কেন জানিনা, সতীশের নিকটও তাহা গোপন রাখিলাম।

একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি। মেয়েটির নাম,—সরযূ। একদিন হঠাৎ শুনিলাম, সরযূর পিতা সতীশকে তাঁহার এই কন্যা সম্প্রদান করিয়া উভয় পরিবারের মধ্যে বহুদিনের স্থাপিত পুরাতন সৌহার্দ্যের বন্ধন আরও দৃঢ়ীভূত করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। পূর্ব্বে আরও দু'একবার এ সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল। এ প্রস্তাব্যে স্বীকৃত হইবার পথে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ আমার বন্ধু এ কথা শুনিবামাত্র আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিল। আমি স্পষ্ট অনুভব করিলাম সেও এ আশা বহুদিন হইতেই হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছে। সকলেই উৎফুল্ল, একমাত্র আমিই এ কথা শুনিয়া পৃথিবী অন্ধকার দেখিলাম এবং একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলাম। কিন্তু এ অবস্থায় মনের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করা যায় না; প্রকাশ করিয়া হাস্যাস্পদ হওয়া অপেক্ষা অদৃষ্টের উপরই নির্ভর করিয়া রহিলাম।

কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে কি যে দারুণ যন্ত্রণা ভয় ও সংশয় ক্ষণে ক্ষণে উদিত হইতে লাগিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে কি না জানিনা; কিন্তু যথার্থই আমি সরযূকে একবার মাত্র দেখিয়াই সমস্ত প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার তুলনায় সতীশের প্রতি আমার ভালবাসা যে কিছু কম, তাহাও বলিতে পারি না। বিবাহের কথাবার্ত্তা ক্রমেই পাকাপাকি হইয়া গেল। যেদিন আমার প্রিয়তম বন্ধু,—প্রেমের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখ হইতে শুনিলাম, তাহাদের বিবাহের দিনও স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে, সেদিন আমার মনের মধ্যে যে ভাব উদিত হইয়াছিল, প্রেম ও কর্ত্তব্যের মধ্যে যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শুধু ভুক্তভোগীই অনুভব করিতে পারে। আমার আত্মসম্মান জ্ঞান এবং বন্ধু ও বন্ধু-পরিবারের প্রতি আমার যে বাধ্য-বাধকতা ছিল, তাহারা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে প্রিয়বন্ধুর সুখের পথে কণ্টকস্বরূপ হইতে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিল। তথাপি এটাও আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, সরযূকে সতীশ বিবাহ করিলে, আমার বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব!

এক একবার মনে হইতে লাগিল, আত্মহত্যা করিয়া

এ পাপ জীবনের অবসান করি। কিন্তু এতদিনের উপার্জ্জিত সুশিক্ষা ও ধর্ম্মনীতি তাহার প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। স্থির করিলাম এ স্থান ত্যাগ করিয়া যেদিকে দুই চক্ষু যায় পলাইয়া যাই, কিন্তু তাহাও পারিলাম না। শেষে মানসিক যন্ত্রণা ও কষ্ট-ভোগের তাড়নায় সাঙ্ঘাতিক পীড়িত হইয়া পড়িলাম। যাহা হউক, এ অবস্থায় পীড়া একটা সান্ত্বনার বস্তু বলিয়া মনে হইল। এদিকে সতীশ আমার অসুখে বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল এবং প্রাণপণ যত্নের সহিত আমার সেবা করিতে লাগিল। সে কদাচিৎ আমার পার্শ্ব ত্যাগ করিত। শৈশবেই মাতৃহারা হইয়া জননীর স্নেহলাভে সে বঞ্চিত ছিল। পিতার আদর-যত্ন তাহার হৃদয়ের সে শূন্য স্থানটা সম্পূর্ণ পূর্ণ করিতে পারে নাই। সেইজন্যই আমার নিঃস্বার্থ ভালবাসার বিনিময়ে সে আমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত। কিন্তু তাহার আদর যত্নে আমার পীড়া দিন দিন বাড়িয়া চলিল। দুই সপ্তাহের মধ্যেই আমার অবস্থা বড়ই সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল। দেশে পিতামাতাকে সংবাদ দিতে আমি নিষেধ করিলাম। হরিবাবুকে বলিলাম, "এর জন্য আপনার কোনও ভাবনা নেই; এমন অসুখ পূর্ব্বে মাঝে মাঝে আমার হতো; শীঘ্রই সেরে উঠবো।" আমার অসুখ বাড়িতেছে

দেখিয়া সতীশ এতই কাতর হইয়া পড়িল যে, বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিন পিছাইয়া দিবার সে প্রস্তাব করিল। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার সেই প্রস্তাবই আমাকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিল। কিন্তু এ পীড়ার মূল কারণ কিছুতেই তাহার নিকট প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে যখন কিছু বলি নাই, তখন এই সময়ে তাহাদের মিলনের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে আমি কোন্ প্রাণে সে কথা তাহাদের নিকট ব্যক্ত করিয়া তাহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে ব্যথা দিব?

একদিন সন্ধ্যার সময় সতীশ আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অতি স্নেহপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তুমি পীড়িত হয়ে পড়ে রইলে, তাই বিবাহের দিন পিছিয়ে দেবার কথা বাবাকে বলেছি; তুমি উপস্থিত না থাকলে বিবাহের কোন অনুষ্ঠানই আমার আদৌ ভাল লাগবে না। তোমার এই দিনরাত বিমর্ষভাব দেখে আমি বড়ই চিন্তিত। এমন কি বিবাহের কথা মন থেকে এক প্রকার দূর হয়ে গেছে। আমার মনে হয় যেন তোমার প্রাণের ভেতর কি একটা যন্ত্রণা জমাট বেঁধে রয়েছে, সেটা তুমি প্রকাশ করতে পারছো না। এই ক'বছরে যদি আমার ওপর তোমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস জন্মে থাকে, তাহলে সব

কথা আমাকে খুলে বল। সে কথা কেউ জানবে না, আর তা দূর করতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করবো।"

আমি কহিলাম, "তোমার ভালবাসার সীমা নেই সে আমি জানি; কিন্তু আমার এ কষ্টের কোনও প্রতিকারও নেই। তুমি জানলেও তা দূর করতে পারবে না। তা বুঝেও কি আমার উচিত, তোমার কাছে সে কথা প্রকাশ করা?"

"সে কথা আমার কাছে প্রকাশ করতে তোমার এমন কি বাধা থাকতে পারে? যদি সত্যকথা লুকুবার চেষ্টা করো, তাহলে জানবো তোমার বন্ধুত্ব সে কেবল মুখের কথা।"

"না, তা কিছু সন্দেহ করো না ভাই; কিন্তু তোমার কাছে সে কথা এখন বলবার নয়।"

সতীশ কোন কথাই শুনিবে না। সে স্পষ্ট জানাইল, না বলিলে সে এমনই অনর্থ ঘটাইবে, যাহার ফল অত্যন্ত শোচনীয় হইবে। এ কথার পর আমি তাহার নিকট সব কথা খুলিয়া বলিতে মনস্থ করিলাম। আর কিছু না হউক অন্তরের জ্বালা ত কতক প্রশমিত হইবে! আমি যে পূর্ব্বে তাহার নিকট এ কথা বলিতে পারি নাই, তজ্জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

সতীশ নীরবে সব শুনিল। আমার কথা শেষ হইতে

না হইতেই সে বলিয়া উঠিল,—"আমার প্রতি তোমার এই যে বিশ্বাসের অভাব, এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার আমার যথেষ্ট কারণ আছে। তুমি কি মনে কর যে, একজন সামান্য বালিকাকে স্ত্রীরূপে লাভ করবার জন্যে আমি তোমার সঙ্গে প্রণয়ের ডোর ছিন্ন করবো। অবশ্য সরযূকে বহুদিন হতেই আমি লুব্ধ নয়নে দেখে আসছি, কিন্তু তোমার সুখ বিধানের জন্যে আমি হাসিমুখে তাকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তুমি দেখছি, এ রকম চুপ করে থেকে, নিজেরও সর্ব্বনাশ করতে, আর বিনাদোষে আমাকেও চিরদিনের জন্যে তোমার যন্ত্রণা-ভোগের উপলক্ষ করে রাখতে। যাক্, আজ থেকে ও দুশ্চিন্তা মন থেকে একেবারে দূর কর। যে রকমে পারি, সরযূর সঙ্গে তোমার বিবাহ ঘটাবই ঘটাবো। তুমি স্থির জেন, তোমার জন্যে এ তুচ্ছ সুখ বিসর্জ্জন দিতে আমি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করবো না। তুমি নিশ্চিন্ত হও, শীঘ্র শীঘ্র সেরে ওঠ; মুখে যা বল্লাম, দেখবে কাজেও তাই করবো।"

এই কথা শুনিয়া উল্লাসে আমার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, যেন কোনও যাদুমন্ত্রের দ্বারা আমার সব রোগ-যন্ত্রণার একেবারে উপশম হইয়া গেল। এরূপ মহৎ-প্রাণ স্বার্থত্যাগী বন্ধুর নিকট এ কথা এতদিন

গোপন রাখিয়াছিলাম ভাবিয়া মনে মনে বড়ই লজ্জিত ও দুঃখিত হইলাম। মুখে কৃতজ্ঞতাসূচক একটি কথাও বাহির হইল না। চক্ষুর্দ্বয় মেজের উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল। এবং মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে গিয়া চক্ষুর্দ্বয় হইতে অশ্রু দরদরধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

আমার মনোভাব অবগত হইয়া সে দুই বাহুদ্বারা আমার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া বলিল,—"এ কথা পাকা রইলো। মনে করোনা, এ ত্যাগে আমার খুব একটা কষ্ট বা তোমার ওপর খুব রাগ হচ্ছে। যতশীঘ্র পার সেরে ওঠ; তোমার সন্তোষবিধানার্থ এ শুভকার্য্য যত শীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করতে ইচ্ছা করি।"

তাহার এ মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইবার পথে যত প্রকার বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, তাহার উল্লেখ করিয়া আমি বলিলাম, "সরযূর পিতামাতাকে সম্মত করানই যে বড় শক্ত হবে। তাঁরা তোমাকে ছেড়ে আমার ন্যায় একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের হাতে কন্যা সমর্পণ করতে চাইবেন কেন?"

"সে বিষয়ে তোমার কোনও ভাবনা নেই। সব দিক আমি ভেবেছি; সহজে এ কাজ সম্পন্ন হবে না, তা আমি জানি; সরযূর পিতা নিশ্চয়ই সম্মত হবেন না। তাই

তাঁকে এ কথা জানাবারই দরকার নেই। কৌশলে কাজ উদ্ধার করতে হবে। তুমি ত জান, আমরা দুজনে দেখতে ঠিক এক রকম; এমন কি সময় সময় আমাদের আত্মীয় বন্ধুবাও আমাদের ভুল করে বসে।

"বরানুগমনের আগে আমি লুকিয়ে একবার তোমার ঘরে আসবো। তুমি তখন আমার পোষাক-পরিচ্ছদ পরে বেরিয়ে পড়বে। আমি তোমার বিছানায় শুয়ে থাকবো। আমোদ আহ্লাদের মধ্যে কেউ এত নজর করবে না। উভয় পক্ষের কর্ত্তারা বিবাহের পর আসল কথা যখন টের পাবেন, তখন নিরুপায় হ'য়ে তাঁরা সব চেপে যাবেন। কিন্তু সেরে উঠে তোমার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য আগে লাভ কর। তা না হলে চেহারায় সহজেই ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে। এদিকে তুমি সম্পূর্ণ সেরে না ওঠা পর্য্যন্ত আমি একটা না একটা অছিলা করে বিয়ের দিন পিছিয়ে রাখব।"

ইহার পর দু'চার দিনের মধ্যেই আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলাম। আমার চেহারা পূর্ব্বের ন্যায় সবল হইয়া উঠিল। সতীশ বিবাহের দিন স্থির করিল। সেদিন প্রাতে আমি হঠাৎ অসুখের ভাণ করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলাম। সতীশ প্রথম আমার অসুখের জন্য বিবাহের

দিন পিছাইয়া দিবার প্রস্তাব করিল; কিন্তু সে প্রস্তাবে আর কেহ স্বীকৃত হইল না। সন্ধ্যার সময় সতীশ বরের পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া আমার ঘরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে জোর করিয়া আমার সহিত পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। প্রথমটা যেন তাহার কাজে বাধা দিতে আমার প্রবল ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে আমাকে জোর করিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া আমার শয্যায় শুইয়া পড়িল। আমিও দোষী ব্যক্তির ন্যায় চুপিচুপি নীচে গিয়া অন্যান্য সময়োপযোগী ক্রিয়ানুষ্ঠান শেষ করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। আমার প্রাণের মধ্যে তখন যে অদ্ভুত ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। পরে কন্যার বাড়ী উপস্থিত হইয়া শুভমুহূর্ত্তে পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্র ভূতাবিষ্টের ন্যায় আবৃত্তি করিতে করিতে অগ্নিদেবকে সাক্ষ্য করিয়া সরযূ ও আমি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলাম। সকলেই আনন্দে অধীর হইয়া উৎসবের আমোদ প্রমোদে মগ্ন, পাত্র লইয়া যে এতবড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না।

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই সতীশ আসিয়া হাসিমুখে আমাকে সম্বর্দ্ধনা করিল। তখন এ বিপদ

হইতে উদ্ধার-লাভের উপায় সম্বন্ধে আমরা পরামর্শ করিতে বসিলাম। আজ নিশ্চয়ই আমাদের এ দুরভিসন্ধি ধরা পড়িয়া যাইবে। আমার উপর হরিবাবুর যে গভীর স্নেহ ছিল, তাহার উপরই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমরা দুইজনেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন সতীশের পরিবর্ত্তে আমাকে বরবেশে সজ্জিত দেখিয়া একেবারে চমকিত হইলেন। সতীশ আমার পক্ষ সমর্থন করিয়া আদ্যন্ত সকল ঘটনা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিল। অবশ্য তাঁহাকে লুকাইয়া এত বড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল, সতীশ এমন সুন্দরী স্ত্রী ও ধনী আত্মীয় কুটুম্ব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিল, তাহা অবগত হইয়া তিনি প্রথমটা যে একটু রাগান্বিত হইলেন না, তাহা নহে। কিন্তু আমি তাঁহার চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

তাঁহার মন অনেকটা নরম হইল। স্থির হইল তিনি সরযূর পিতার নিকট গিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিবেন। যাহা হউক এ কার্য্য আশাতীত কৃতকার্য্যতার সহিত তিনি সম্পন্ন করিলেন। আমার বংশগৌরব, বিদ্যাবুদ্ধি ও গুণের শতমুখে প্রশংসা করিয়া কন্যাপক্ষের মন সন্তুষ্ট করিয়া দিলেন। হরিবাবু তখন আমার পিতামাতার নিকট বিবাহের সংবাদ পাঠাইলেন। তাঁহারা প্রথমটা এ সংবাদে বিস্মিত

ও স্তম্ভিত হইলেও, কলিকাতায় আসিয়া পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া সব রাগ তাপ ভুলিয়া গেলেন এবং বিবাহের যৌতুক স্বরূপ নববধূকে বহুমূল্য অলঙ্কার উপহার দিলেন।

(২)

কয়েক মাস পরে বি, এ, পরীক্ষা দিয়া আমি স্ত্রীকে লইয়া পিতার নিকট মোগলসরাই চলিয়া গেলাম। তারপর প্রায় ছয়মাস অতীত হইতে চলিল। ইতিমধ্যে কলিকাতায় আসিবার আর কোনও প্রয়োজন হয় নাই। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর, সেখানকার বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ পাইয়াছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, সতীশ পরীক্ষায় ফেল হইয়াছিল। পরীক্ষার পূর্ব্বেই তাহার পড়াশুনায় কি রকম একটা শৈথিল্য লক্ষ্য করিয়াছিলাম। মুখে কিছু প্রকাশ না করিলেও, বাহিরে তাহার কি রকম একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। দেশে আসিবার পর তাহাকে উপর্য্যুপরি পাঁচ ছয়খানি পত্র লিখিয়াও একখানিরও উত্তর পাইলাম না। আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হইলাম।

শেষে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া একদিন কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। সতীশদের বাড়ীর সম্মুখীন হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। সে বাড়ী এখন অন্য লোকের অধিকারে। প্রতিবেশীদের নিকট সংবাদ লইয়া এইমাত্র জ্ঞাত হইলাম যে, তাহার পিতার মৃত্যুর পর সতীশ বাড়ী বিক্রয় করিয়া পিতার ঋণ পরিশোধ-পূর্ব্বক দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে, কেহই জানে না। তাহাতে আমার উদ্বেগের মাত্রা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। হঠাৎ যৌবনে সংসারের উপর এত বৈরাগ্য উপস্থিত হইবার কারণ কি? নিশ্চয়ই সে সরযূর প্রতি খুব আসক্ত ছিল এবং আমার জন্য এ স্বার্থত্যাগ করিয়াও সে গভীর ভালবাসার মায়াডোর ছিন্ন করিতে পারে নাই। আমি নানাস্থানে তাহার খোঁজ করিলাম; কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইলাম না। শেষে ব্যথিত অন্তঃকরণে বাড়ী ফিরিলাম।

পর বৎসর পূজার ছুটিতে বারাণসী তীর্থক্ষেত্রে বেড়াইতে যাই। একদিন অপরাহ্ণে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকট একদল লোক জড় হইয়া গোলমাল করিতেছিল। ব্যাপার কি অনুসন্ধান করিবার জন্য অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম পুলিস

প্রহরী একটী লোককে ধরিয়া প্রহার করিতেছে। লোকটা না কি হত্যাপরাধে ধৃত হইয়াছে। আসামীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেলেও, তাহাতে পাপকার্য্যের চিহ্ন-মাত্র নাই। আমি হঠাৎ সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলাম। অদ্ভুত বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। মনে হইল, যেন স্বপ্ন দেখিতেছি। পুনর্ব্বার চক্ষু তুলিয়া ধৃতব্যক্তির মুখের দিকে তাকাইলাম। অমনই আমাদের চারিচক্ষু মিলিত হইল। তাহার পাংশু মুখ ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম, আমার সমস্ত দেহ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। আমি চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা আমাকে ধরিয়া ফেলিল। সে সময় কে যেন ক্ষীণস্বরে আমার নাম ধরিয়া ডাকিল। এ কণ্ঠস্বর যে বড় পরিচিত! আমার মনের সমস্ত সন্দেহ নিমিষে দূর হইয়া গেল। সতীশ হত্যাপরাধে ধৃত! আমি চোখ চাহিয়া দেখিলাম, আমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সতীশ তাহার শৃঙ্খলাবদ্ধ শীর্ণ হাতদুখানি প্রসারিত করিয়া দিয়াছে।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মনে হইল যেন অসীম বলে আমি বলীয়ান হইয়াছি। চীৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম,—"আমি খুনী! ও লোকটা নির্দ্দোষ;

ওর বন্ধন মুক্ত করে দাও। বিনাদোষে ওকে শাস্তি দিও না।"

আমি একেবারে বন্ধুর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম এবং তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া পুলিসের লোকের নিকট ধরা দিলাম। তাহারাও আমাদের দুইজনের চেহারার সাদৃশ্য দেখিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাকে বন্ধন করিল। সমবেত দর্শকবৃন্দ এ দৃশ্যে বিচলিত হইল। পুনর্মিলনের আনন্দ ব্যতীত আর কোনও চিন্তা তখন আমাদের মনের মধ্যে উদিত হইল না। পুলিস লোকজনদের সরাইয়া দিয়া আমাদের দুই জনকেই বাঁধিয়া থানায় লইয়া গেল।

থানায় গিয়া ইনস্পেক্টারের নিকট আমরা এইমাত্র আবেদন করিলাম যে, যতদিন না বিষয়টির সমস্ত তদন্ত শেষ হয়, ততদিন একই ঘরে আমাদের দুইজনকে বন্দী করিয়া রাখা হউক। অনেক কাকুতিমিনতির পর, আমাদের এ আবেদন গ্রাহ্য হইল। নির্জ্জন কারাকক্ষে আমরা প্রথম যখন পরস্পরের পার্শ্বে দাঁড়াইলাম, তখন আমাদের স্ফূর্ত্তি দেখে কে? ভবিষ্যৎ বিপদের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া আমরা পরস্পরের হাত ধরিয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলাম। এ অশ্রু আনন্দের কি দুঃখের, কে বলিবে?

সতীশ প্রথম কথা কহিল,—"কেন তুমি নিজের জীবনকে বিপন্ন করে আমায় রক্ষা করতে গেলে? বিচারে আমার যা হবার তা হতো!"

"বিচার! আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না যে, এ কার্য্য তোমার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। আমি কখনও তা বিশ্বাস করতে পারবো না।"

"তাহলে তুমি কি বিশ্বাস কর যে, আমি নির্দ্দোষ।"

"আমি কি অন্যরকম ভাবতে পারি?"

প্রীতিপূর্ণ স্বরে সে তখন উত্তর করিল,—"তাহলে আজও তুমি আমায় সেই রকমই ভালবাস; ভাই, যথার্থই আমাকে অন্যায় করে ধরে এনেছে। তোমাকে সব কথা খুলে বলছি শোন। তুমি কলকাতা ছাড়বার দু'মাস পরেই আমার পিতার মৃত্যু হয়। যদিও বাজারে তাঁর খুব সম্ভ্রম প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু নগদ টাকা কিছু ছিল না; বরং বাজারে কিছু দেনাই ছিল। বাড়ী বিক্রয় করে সেই দেনা শুধে, হাতে সামান্য কিছু টাকা রইলো। আত্মীয় বন্ধুরা কেউ এ বিপদে কোন সাহায্য করতে রাজি হলো না। তখন সহর ত্যাগ করে বিদেশে ভাগ্য পরীক্ষা করতে যাবো বলে স্থির করলাম।

"বাবার এক বন্ধু বক্সারে আছেন। তিনি সেখানে

কারবার করে অনেক টাকা উপার্জ্জন করেছেন। পুঁজিপাটা বা কিছু সামান্য ছিল, তাই নিয়ে যাত্রা করলাম। কিন্তু সময় খারাপ পড়লে অদৃষ্টে অনেক ভোগ থাকে। রাত্রে ষ্টেশনে নেবে তাঁর বাসায় যাচ্ছি, পথে ডাকাতেরা আমার যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে একপ্রকার নিঃসহায় অবস্থায় আমাকে ফেলে রেখে গেল! আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখলাম। সে অবস্থায় আর পিতৃবন্ধুর বাড়ী যাওয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করলাম না। আমার পরণে এমন কাপড়চোপড়ও ছিল না যে, লোকালয়ে বার হই বা চাকুরির চেষ্টা করি। তদবধি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেই একপ্রকার প্রাণ ধারণ করছিলাম।

"তোমার কথা বহুবারই আমার মনের মধ্যে উদিত হয়েছে। তখন যে আমার কি কষ্ট হতো, তা মুখে প্রকাশ করতে পারি না। কিন্তু এত দুরবস্থাতেও পড়ে, আমি তোমার সম্মুখে ভিক্ষুক-বেশে দাঁড়াতে অপমান বোধ করলাম। একদিন যার সঙ্গে সমান অবস্থায় জীবন কাটিয়ে এসেছি, পরন্তু যার মঙ্গলের জন্য একদিন নিজের শ্রেষ্ঠ সুখ স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়েছি, তার কাছে ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়াতে প্রবৃত্তি হলো না। ভাই, তুমি কিছু মনে করো না। কিন্তু এ বৃথা দর্প আমার অচিরেই চূর্ণ হয়ে

গেল। তোমার দেশে যাবার জন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। যদিও মধ্যে মধ্যে মনে সন্দেহ হতো যে তুমিও আমার এ অবস্থায় হয় ত অনুকম্পার সঙ্গে বিরক্তিও প্রকাশ করবে, কিন্তু তোমাদের একবার দেখবার জন্ত প্রাণটা বড়ই কাতর হয়ে উঠলো। কিন্তু এ সান্ত্বনাও বিধাতা আমার ভাগ্যে লেখেন নি। হাতে পয়সা ছিল না, পদব্রজেই রওনা হলাম। কিন্তু পথেই প্রবল জ্বরের বেগে চলনশক্তি রহিত হয়ে কিছুকাল সরকারী হাসপাতালে পড়ে থাকতে হলো। একটু সুস্থ হয়ে উঠে অনেক অনুসন্ধান করে আমি তোমাদের দেশে গিয়ে উপস্থিত হই। হায়, তৎপূর্ব্বে যে কতবার মৃত্যুকামনা করে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেছি, এ হতভাগ্য জীবন শেষ করবার জন্ত কত উপায় চিন্তা করেছি, তার সংখ্যা নেই। কিন্তু দুঃখের মাত্রা তখনও পূর্ণ হয় নি, পাত্র তখনও কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয় নি। ভাই, তুমিই সেই পাত্র আমার পূর্ণ করে দিয়েছ—"

"আমি! সম্পূর্ণ অসম্ভব! আমি তোমাকে কত স্থানে অন্বেষণ করে বেড়িয়েছি, তোমাকে খুঁজে বার করবার জন্ত প্রাণপণ পরিশ্রম করেছি।"

"—তখন তুমি দেশেই ছিলে। তোমার বাড়ীর পাশেই এক গাছতলায় বসে আমি তোমার নিকট ভিক্ষা

চাই। কিন্তু তুমি আমার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত না করেই চলে যাও।"

"তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো? এ কথা যে বিশ্বাস হয় না।"

"ভাই, এ কথা সত্য। তোমাকে না দাঁড়াতে দেখে, একবার মনে হলো, আমার নামটা চেঁচিয়ে তোমাকে বলি। কিন্তু তুমি একবার মাত্র আমার দিকে ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাড়াতাড়ি চলে গেলে। বোধ হয় বিশেষ কোনও দরকারে যাচ্ছিলে।"

"ভাই, আমাকে ক্ষমা করো। তোমার কি বিশ্বাস হয় যে, আমি জেনে শুনে এ রকম ব্যবহার তোমার সঙ্গে করেছি?"

"ভাই, তোমার কোনও দোষ নেই। কারণ এই অদ্ভুত বেশে রোগজীর্ণ দেহে আমার চেহারার যে কতদূর পরিবর্ত্তন হয়েছিল, সেটা আমিও তখন বুঝতে পারিনি। কিন্তু তখন ভাবলাম যে, তুমিও যখন ঘৃণাভরে আমাকে ত্যাগ করলে, তখন বেঁচে থাকা আমার বিড়ম্বনা মাত্র। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তখনই প্রাণটা কেন কেটে দেহ থেকে বেরিয়ে এলো না! আমি সে স্থান ত্যাগ করে সম্মুখে অগ্রসর হলাম। কিন্তু কোথায় চল্লাম, তা নিজেও

জানি না। সংসারের উপর একটা তীব্র বৈরাগ্য এসে উপস্থিত হলো। কিছুদিন পরে ঘুরতে ঘুরতে এ প্রদেশে হাজির হই। তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে, এর চেয়ে দুরবস্থায় আমায় আর কোনও দিন পড়তে হবে। শুক্লকল্প সন্ধ্যার সময় বেগে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হলো। তখন নগরের প্রান্তভাগে এক পরিত্যক্ত ভগ্নবাটীর মধ্যে আশ্রয় নিলাম। চারিদিকে অন্ধকার; তার ভেতর মানুষ বা হিংস্র পশু আছে কিনা কিছুই টের পেলাম না। আর তা খোঁজও করিনি, কারণ তখন প্রাণের মায়া একেবারে ত্যাগ করেছি। পথভ্রমণে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, দুদিন পেটে কিছু আহার নেই। শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন প্রাতে জন কতক পথিক আমাকে ঠেলে উঠিয়ে দিল। তখন পার্শ্বে শায়িত এক মৃতদেহের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ল। কিছুক্ষণ নির্ণিমেষ নয়নে সেই ভীষণ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু আমার অবস্থা তখন এতই শোচনীয় যে, সেই মৃতব্যক্তির অবস্থা দেখেও আমার মনে হিংসা হলো। তার উদ্দেশ্যে বল্লাম,—হায়, তুমিও সৌভাগ্যবশে চিরবিশ্রাম লাভ করেছ; আমি এখন যে যন্ত্রণা ভোগ করছি তা কিছুমাত্রও অনুভব করতে পারছো না। তোমার সঙ্গে যদি অবস্থার বিনিময় করতে

পারতাম, তাহলে এ ভীষণ যন্ত্রণার চির অবসান হয়ে যেতো!"

"নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে দুদণ্ড শোক করবারও অবসর জুটলো না। ক্ষণপরেই পুলিশের লোক এসে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলো। আমি হাসিমুখে শান্তভাবে তাদের নিকট ধরা দিলাম, বড় আশায় যে, এ যন্ত্রণা আর বেশীদিন ভোগ করতে হবে না। হত্যা অপরাধে ধৃত হয়েছি; নিজেকে উদ্ধারের কোনও চেষ্টা করা নিষ্ফল ভাবলাম। অনুরোধ করলাম যে, শীঘ্র আমাকে একটু জল এনে দাও তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে; তারা দয়া করে সে অনুরোধ আমার রক্ষা করেছিল। জল খাবার সময় পথে অনেক লোক জড় হয়ে গেল। তারপর যা ঘটেছে, তুমি সবই জান।"

আমি আত্মহারা হইয়া বন্ধুর এ দুঃখকাহিনী শুনিতে ছিলাম। সে থামিতেই বলিয়া উঠিলাম,—"বড়ই সৌভাগ্য আমার যে, ঠিক সময়ে এসে হাজির হতে পেরেছি।"

"ইতিমধ্যেই তোমার জীবনকে বিপদাপন্ন করে, তুমি ভালবাসার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছ। এ বিষয়ে আর বেশী জিদ করো না। সরযূ, যাকে স্বেচ্ছায় তোমার হাতে সমর্পণ করেছি, তার বিষয় একবার চিন্তা কর। আমার জন্ম

তোমাকে আর কিছু ভাবতে হবে না। আমি তোমাকে সরল অন্তঃকরণে সকল দায়িত্ব হতে মুক্তি দিলাম। ভাই, আমার জীবন রক্ষা করে তুমি যে আমায় বিশেষ একটা উপকার করবে ভাবছো, তা হবে না। বরং আমি তাতে অসন্তুষ্টই হব। এ দুঃখের বোঝা অসহ্য হয়েছে। মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুতেই এ ঘাড় থেকে নামবে না। যাও, জেলরক্ষকের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বল গে, তোমাকে ছেড়ে দেবে। বৃথা আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করো না। আমার জীবনের গণা দিন ফুরিয়ে এসেছে।"

"কখনই না।"

"সরযূর কথা একবার ভাব। আমি একজন নিঃসঙ্গ অপদার্থ হতভাগা জীব! পৃথিবীর একটা ভার,—একটা কলঙ্ক।"

"তোমাকে উদ্ধার করতে, পৃথিবীতে আমার সব চেয়ে যা প্রিয় বস্তু স্ত্রী পুত্র সবই ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি। সতীশ, কেবল পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধুভাবে একবার তুমি আমাকে ভালবাস, বিশ্বাস কর।"

তাহার নেত্রদ্বয় সজল হইয়া উঠিল। কিন্তু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বাহিরে কিসের গোলমাল শুনিতে পাওয়া গেল। আমাদের ঘরের দরজা খুলিয়া একজন পুলিশ কর্ম্মচারী

ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "প্রকৃত আসামী ধরা পড়েছে, তোমরা দু'জনেই সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

আমি এ সংবাদে একেবারে নাচিয়া উঠিলাম। সতীশেরও নির্দোষিতা প্রমাণিত হইল,—আমিও সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইলাম। কিন্তু এই মুক্তিই তাহার ভাগ্যে চিরমুক্তিতে পরিণত হইল। এই আকস্মিক প্রতিক্রিয়া তাহার দুঃখজীর্ণ দেহ সহ্য করিতে পারিল না। সতীশ কিছুক্ষণ উৎসুক নেত্রে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল এবং আমি না ধরিলে সে তখনই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া যাইত।

সে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—"আমি মরতে এসেছি। সতীশ, সরযুকে আমার দোষ সব ক্ষমা করতে বলিস্।"

"ক্ষমা! ও রকম কথা কেন বলছো! তোমার কি হয়েছে?"

"হাঁ, আমাকে তোরা দুজনে ক্ষমা করিস্! আমি প্রথম তাকে দেখা অবধি এ যাবৎ ভালবেসে এসেছি,—সমান ভাবে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে। তোর হাতে তুলে দিয়েও কিছুতেই তাকে ভুলতে পারি নি। তাকে হারিয়েই দিন দিন ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হতে থাকি,—আজ আমার এ অবস্থা। সরযূ ভিন্ন জীবনই বৃথা!"

সে আর কথা বলিতে পারিল না। আমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া তাহার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া গেল। তদবধি, যাহাকে সে এরূপ নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসিত, তাহার জন্যই জীবন ধারণ করিয়া আসিতেছি। পৃথিবীর কোন সুখই আমার নিকট ইহার অর্দ্ধেক প্রিয়ও নহে, যত জীবনের পরপারে সেই উজ্জ্বল পৃথিবীতে বন্ধুর পূত আত্মার সহিত পুনর্মিলনের দুরাশা!

এক ঢিলে দুই পাখী।

(১)

যতীন বাবু হাওড়া ষ্টেসনে ট্রেণের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করিলেন। তিনি ধূমপায়ী, অতএব দেখিয়া শুনিয়া যে কামরায় ধূমপানের বাধা নাই, সেই খানেই উঠিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া বেশ আরাম করিয়া গদির উপর বসিলেন। তিনি কলিকাতার বিখ্যাত ঔষধের দোকান পাল এণ্ড কোম্পানির বিজ্ঞাপনবিভাগে কাজ করেন, অর্থাৎ বিদেশে নবাবিষ্কৃত ঔষধাবলির নাম প্রচার করিয়া বেড়ান। দোকানের সত্ত্বাধিকারী "সরল-ভেদী বটিকা" নামে সম্প্রতি এক নূতন পেটেণ্ট ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন; দূর প্রদেশে গিয়া এই ঔষধের প্রচারকল্পে চেষ্টা করাই যতীনবাবুর রেলযাত্রীর উদ্দেশ্য। সে দেশের লোকেরা এই ঔষধ সম্বন্ধে তখনও কিছু শুনে নাই।

যতীনবাবু একজন পরিশ্রমশীল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। তাঁহার মাসিক মাহিনাও খুব মোটা। সেইজন্যই জীবনের ছোটখাট সুখস্বচ্ছন্দগুলি উপভোগ করা তাঁহার আয়ত্বের মধ্যে ছিল।

ট্রেণে তিনি সর্ব্বদাই প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াত করিতেন, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হোটেলে আহার করিতেন এবং বর্ত্তমান ফ্যাসান অনুযায়ী বহুমূল্য পোষাক পরিচ্ছদে নিখুঁত ভাবে সজ্জিত থাকিতেন। আদব-কায়দাও তাঁহার বেশ দুরস্ত ছিল।

তিনি যখন গাড়ীতে ঢুকিলেন, তখন সেখানে আর কেহ ছিল না। কিন্তু ট্রেণ ছাড়িবার অল্প পূর্ব্বে একজন চোকাচাপকানধারী ভদ্রলোক সেই কামরায় প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোকটি যতীনবাবুর সমবয়স্ক। এক হিন্দুস্থানী ভৃত্য সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বেঞ্চির উপর চামড়ার একটি ছোট ব্যাগ রাখিয়া গাড়ীর দরজার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল।

ভদ্রলোকটি চাকরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"পারি ত রাত্রি দশটার গাড়ীতেই ফেরবার চেষ্টা করবো। যদি আমার দেরী হয়ে যায়, তা হ'লে মনিব ঠাকুরাণীকে আমার জন্য অপেক্ষা করতে বারণ করো।" ভৃত্য উত্তর করিল, "যো হুকুম।" এবং যাইবার সময় মনিবকে বিশেষ আদব-কায়দার সহিত সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। যতীন-বাবু বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সহযাত্রী একজন সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল,—যতীনবাবু চুরুট ধরাইয়া নিজ মনে নানাকথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সহযাত্রীও একটি সুন্দর রৌপ্য-নির্ম্মিত কেস হইতে একটি 'হাবানা' চুরুট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিলেন। ধূমপান করিতে করিতে দুইজনেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে যতীনবাবু তাঁহার সহযাত্রীর সহিত আর কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার স্বভাবসুলভ মিষ্টস্বরে সহযাত্রীকে তাঁহার গন্তব্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, উভয়েই এক স্থানে যাইতে-ছেন। তাঁহার সহযাত্রী কি কার্য্যে সেখানে যাইতেছেন তাহা জানিবার জন্য তাঁহার বড়ই কৌতূহল হইল। কিন্তু ভদ্রলোককে হঠাৎ সে কথা জিজ্ঞাসা করা সভ্যতার বাহিরে; কাজেই মনের কৌতূহল মনেই চাপিয়া তিনি সংবাদপত্র পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। তাহা পড়িয়া জানিতে পারি লেন যে, অদ্য অপরাহ্নে সেখানে কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত রামমোহন ঘোষ, এম,এ, বি, এল মহাশয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিবেন।

যতীনবাবু আর স্থির থাকিতে না পারিয়া সহযাত্রীকে প্রশ্ন করিলেন—"আপনি সেখানে কি নূতন হাঁসপাতালের ভিত্তি স্থাপন কর্‌তে যাচ্ছেন ?"

"হাঁ! আপনার অনুমান ঠিক; কিন্তু আপনি কি করে জানলেন, আমি সেখানে যাচ্ছি? বোধ হয় আপনি সেখানকারই লোক!"

"না, আমি এ সংবাদ এইমাত্র সংবাদপত্রে পড়লাম। মশায়ের নামই বোধ হয় রামমোহন বাবু!"

"হাঁ আমারই নাম। এই গ্রামের নামও আমি পূর্ব্বে জান্‌তাম না। কিন্তু এ প্রকার দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনে আমার বিশেষ সহানুভূতি আছে শুনে সেখানকার লোকেরা আমাকে এ কাজের জন্য ভারি পীড়াপীড়ি করে ধরেছে। আমি তাদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে সেখানে যাচ্ছি। অন্য দরকারী কাজ কর্ম্ম সব ফেলে, অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও আমাকে এ কাজ কর্‌তে যেতে হচ্ছে। তা ছাড়া আমার শরীরটাও আজ তত ভাল নয়। খালি ঘুম পাচ্ছে!"

"আপনার শরীর অসুস্থ শুনে বড়ই দুঃখিত হ'লাম। বোধ হয় অতিরিক্ত পরিশ্রমে এ রকম হয়েছে।"

"না, ঠিক তা নয়। আমার লিভারের দোষ ঘটেছে বলে মনে হয়। এ রকম প্রায়ই আমাকে ভুগ্‌তে হয়।"

যতীনবাবু উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"এর জন্য আপনাকে এত কষ্ট ভোগ কর্‌তে হয়! এ অসুখ ত সহজেই সেরে যায়। আপনি পাল এণ্ড কোম্পানির 'সরল-

ভেদী বটিকা' সেবন করে দেখুন। দু'চার দিনের মধ্যে একেবারে নীরোগ হয়ে যাবেন। এ বটিকা লিভারের পক্ষে অমোঘ ওষুধ। আমার কাছে এক বাক্স আছে। আপনি দয়া ক'রে একটা বড়ি খেলে বিশেষ বাধিত হব।"

ঘোষ মহাশয় ধীরে ধীরে বলিলেন—"না আপনার কথা রাখতে পারলাম না, মাপ করবেন! আমি পেটেণ্ট ওষুধের উপর একেবারে চটা। ওসবে আমার আদৌ বিশ্বাস নেই।"

যতীনবাবু নাছোড়বান্দা, তিনি জিদ করিতে লাগিলেন—"কিন্তু মহাশয় এ বড়িগুলির গুণ অসাধারণ। এ যেমন-তেমন পেটেণ্ট ওষুধ নয়! এর বিস্তর কাটতি, একবার পরীক্ষা করেই দেখুন!"

"কই পূর্ব্বে ত এ ওষুধের নাম কখনও শুনিনি। আজ এই প্রথম আপনার নিকট শুনলাম।"

যতীনবাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"এ্যাঁ, বলেন কি মহাশয়! এর নাম শোনেন নি! এ বটিকার বিজ্ঞাপন ত সর্ব্বত্রই দেওয়া হয়েছে।"

ঘোষ মহাশয় একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"ওঃ বিজ্ঞাপন। সে ত আমি পড়িই না। বিশেষতঃ ওষুধের বিজ্ঞাপন! ঐ সব হাতুড়ে ডাক্তারের তৈরি ওষুধের নাম শুনলেই ভয় পায়।"

এই উত্তর শুনিয়া যতীনবাবু হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন। রামবাবুও তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। একজন অপরিচিত লোক তাঁহার শরীর লইয়া এরূপ অনধিকার চর্চ্চা করিতেছে, তিনি তাহা বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা দুইজনেই গুম হইয়া রহিলেন।

সহযাত্রীর সহিত আর কথা বলিবার ইচ্ছা না থাকায় বা পেটের যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাওয়ায়, যে কারণেই হউক রামমোহনবাবুর তন্দ্রা আসিল। তিনি গাড়ীর কোণে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

যে ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হইবে ট্রেণ যথাসময়ে সেখানে আসিয়া থামিল। কিন্তু রামমোহনবাবু তখনও ঘুমে অচৈতন্য!

গাড়ী থামিতে যতীনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন! ঘুমন্ত উকিলের প্রতি একবার তাকাইলেন, তাঁহার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। পেটেণ্ট ঔষধের উপর তাঁহার সহযাত্রী যে ঘৃণাব্যঞ্জক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, একথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তিনি যে পেটেণ্ট ঔষধের এজেণ্ট, সেই পেটেণ্ট ঔষধকে তাচ্ছিল্য করা আর তাঁহাকে তাচ্ছিল্য করা একই কথা। এই কথাই বারবার তাঁহার মনে হইতেছিল। তিনি ইহার জন্য আপনাকে বড়ই অপমানিত বোধ করিতে-

ছিলেন। তাঁহার চিত্ত এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া ধীরে ধীরে গাড়ীর দরজা খুলিয়া নিজে বাহির হইয়া আসিলেন। উকিলবাবু তখনও অঘোরে ঘুমাইতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। সেদিন আর সভাস্থলে উপস্থিত হইবার তাঁহার কোন উপায় রহিল না। সহযাত্রীর অবস্থা ভাবিয়া তিনি বড়ই উৎফুল্ল হইলেন। ভাবিলেন, এইবার ঠিক প্রতিশোধ লওয়া হইল।

---

(২)

যতীনবাবু অন্য গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। যথাসময়ে গাড়ী গন্তব্যস্থানে আসিয়া পৌঁছিল। তিনি প্লাটফর্মে নামিয়া দেখিলেন ষ্টেসনটি সুন্দর পতাকা ও লতাপাতায় সাজান হইয়াছে। নগরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ প্লাটফর্মের উপর দাঁড়াইয়া কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

তিনি খানিকক্ষণ অব্যবস্থিতচিত্তে প্লাটফর্মের উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। এদেশে তিনি এই প্রথম আসিয়াছেন, কোন্ দিকে যাইবেন, কিছু ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না; এমন সময় একজন বৃদ্ধলোক, বোধ হয় দেশের জমিদার,

ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, আপনিই কি রামমোহনবাবু?"

হঠাৎ একটা ফন্দী তাঁহার মাথার ভিতর খেলিয়া গেল, তিনি এক দুঃসাহসিক কার্য্য করিবার সঙ্কল্প করিলেন। যদিও স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু এমন ভাব দেখাইলেন যেন তিনিই রামমোহনবাবু।

সকলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সভামণ্ডপে লইয়া গেল। হাঁসপাতালের ভিত্তিস্থাপন কার্য্য শেষ হইলে, তিনি সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সম্মুখে ইংরাজী ভাষায় এক সুন্দর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। শ্রোতৃগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ঘন ঘন করতালী দিতে লাগিল। বক্তৃতার শেষ অংশটুকুতে সকলের মন বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সেটুকু আমরা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম,—

"সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ! এইরূপ দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠার এখনও দরকার আছে বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আর কিছুদিন পরে ইহার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। তখন ইহা অতীতের স্মৃতিস্বরূপ আমাদের মানসপটে অঙ্কিত থাকিবে। সেদিন আসিবার আর বেশী বিলম্ব নাই। মানুষের ক্ষমতা ও বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ বিকাশের

ফলস্বরূপ পাল এণ্ড কোংর "সরলভেদী বটিকার" সৃষ্টি হইয়াছে; সেই বটিকারই কথা আমি বলিতেছি। আপনারা তাহা বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিতেছেন! এই ঔষধের নাম আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। এই অদ্ভুত আবিষ্কার সকলেই একমুখে প্রশংসা করিতেছেন। ইহা চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। ইহার শেষ ফল যে কি হইবে কেহই বলিতে পারেন না। এই বড়ি জীর্ণ ম্যালেরিয়ার মৃতসঞ্জীবনী সুধা, প্লীহা ও যকৃৎ সংক্রান্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কাজ করে। ইহা পেটবাথা, অম্বল, অগ্নিমান্দ্য, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মেহ, প্রমেহ প্রভৃতি রোগের অদ্বিতীয় ঔষধ। এই বড়ি সেবনে জ্বর, সর্দ্দি, কাশী, বায়ুরোগ, মূর্চ্ছারোগ, উন্মাদ রোগ এবং হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি সকলপ্রকার রোগই আরোগ্য হয়। পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুর যাবতীয় দুঃসাধ্য রোগের ইহা অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা একাধারে রোগনাশক ও বল-বর্দ্ধক টনিক। ইহা আরোগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পৌষ্টিক ঔষধাদির পাটরাণী, চিকিৎসা ব্যবসায়ীগণের অমোঘ অস্ত্র, দেহশক্তির অক্ষয় ভাণ্ডার, বৃদ্ধের যুবত্ব লাভ করিবার এক-মাত্র মন্ত্র, দরিদ্র রোগীগণের একমাত্র আশীর্ব্বাদ! এক কথায়, ইহা মনুষ্যকে নবজীবন দান করে। চিকিৎসা-জগতে

ইহা অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। ইহার অসম্ভব কাটতি; লক্ষ লক্ষ প্রশংসাপত্র। মোটের উপর পৃথিবীর সমস্ত লোক যখন এই ঔষধ সেবন করিবে, তখন পৃথিবীতে রোগ তাপ জরা বার্দ্ধক্য আর থাকিবে না। এই ঔষধের গুণ দেখিয়া স্বয়ং চিত্রগুপ্তকেও চিন্তিত হইতে হইবে। ধরাতল সুখ ও শান্তির আগার হইবে। সকলেই চিরযৌবন ভোগ করিবে। তখন আর এরূপ দাতব্য চিকিৎসালয়ের কোন প্রয়োজনই থাকিবে না।

"কিন্তু সেজন্য আমাদের দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ এই সকল হাঁসপাতাল বাড়ী তখন লাইব্রেরী, যাদুঘর ও সাধারণ পাঠাগারে পরিণত হইয়া দেশবাসীকে কর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিবে। মানুষের তিমিরাচ্ছন্ন কুসংস্কার-পূর্ণ মনকে সত্য ও জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিবে। নর-নারীর স্বাস্থ্যের সহিত তাহাদের শিক্ষার প্রতিও দৃষ্টি রাখা যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা আপনাদের ন্যায় শিক্ষিত ভদ্র-মণ্ডলীর নিকট বলাই বাহুল্য। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, সে শুভদিন আসিবার বেশী বিলম্ব নাই। এই সরলভেদী বটিকা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিবে।"

বক্তৃতাশেষে যতীনবাবু আসন পরিগ্রহ করিলেন। ঘন ঘন করতালিতে সভামণ্ডপ কাঁপিয়া উঠিল। তারপর

জমীদার মহাশয় তাঁহাকে গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইলেন। জমীদারবাবু যাহা বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, অদ্যকার সভার সভাপতি মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত উকিল। তিনি যে তাঁহার অশেষ কাজ ফেলিয়া এতটা স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিয়া আমাদের সভায় যোগদানপূর্ব্বক আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই মহত্বের পরিচায়ক। তজ্জন্য তিনি যে আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র তাহা বলাই বাহুল্য। জমীদার মহাশয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে একজন পিওন একখানি টেলিগ্রাম লইয়া যতীনবাবুর দিকে অগ্রসর হইল। তিনি তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিলেন—"আমারই টেলিগ্রাম বোধ হয়, দেখি।" পিওনও স্বহস্তে তাঁহার হাতে টেলিগ্রামখানি দিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিল।

টেলিগ্রামখানি জমীদারের নামে সম্বোধন করা হইয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল,—"বড়ই দুঃখের কথা, যে ট্রেণে দুর্ঘটনা ঘটায় যথাসময়ে পৌঁছিতে পারিলাম না। আজ আর ওখানে উপস্থিত হইবার কোন উপায় নাই। সবিশেষ সংবাদ পত্রযোগে জানাইতেছি। আমার ত্রুটী আপনারা মার্জ্জনা করিবেন—

ইতি শ্রীরামমোহন ঘোষ।"

যতীনবাবু টেলিগ্রাম পড়িয়া জমীদারকে বলিলেন,—"বড়ই দুঃখের বিষয় যে বাড়ী হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম, আমার স্ত্রী হঠাৎ সাংঘাতিক পীড়িত হইয়াছেন। আমাকে এখনই যাইতে হইবে। আপনারা কিছু মনে করিবেন না।"

এই বলিয়া তিনি সোজা ষ্টেসনের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী তাঁহার স্ত্রীর অসুখের কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখ জানাইল। পথে যাইতে যাইতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—আজ আমার কি সুদিন। আশ্চর্য্য প্রদীপের গল্পের মত একদিনের জন্য সভাপতি হইয়া কতই না আদর অভ্যর্থনা উপভোগ করা গেল। তাহার সঙ্গে আমার যা কাজ, ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রচার করা, তাও চূড়ান্তভাবে হইল ;—আজ একঢিলে দুই পাখী মারিলাম !"

পরদিন প্রাতঃকালে রামমোহনবাবুর পত্র জমীদার মহাশয়ের হস্তগত হইল। তাহা পড়িয়া তথাকার লোক হাসিয়াই অস্থির। তারপর যতই দিন যাইতে লাগিল ক্রমেই এই মজার কথা সকলে ভুলিতে লাগিল বটে, কিন্তু সেই "সরলভেদী বটিকা"র কথা কেহই ভুলিতে পারিল না। বিশেষতঃ ঘোষ মহাশয়ের প্রাণে প্রাণে তাহা গাঁথা রহিল। জীবনে এমন বেয়াকুব তাঁহাকে আর কখনও হইতে হয় নাই। যে জিনিষ লইয়া তাঁহার উপর দিয়া এতবড় একটা পরিহাস হইয়া গেল, তাহা কি ইহজীবনে ভোলা যায় !

সম্পূর্ণ